Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১১ আগস্ট, ২০২০

৪৩ বর্ষ ২৩ সংখ্যা ১০ আগস্ট, ২০২০, সোমবার, ২৫ শ্রাবণ, ১৪২৭

কাকাবাবু ও হরেকৃষ্ণ কোঙারের জন্মদিন পালিত জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৫ আগস্ট : ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মজুফ্ফর আহমেদ ও কৃষক আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার-এর জন্মদিন পালিত হল জেলাজুড়ে। এদিন যদিও রাজ্য জুড়ে ছিল লকডাউন। করোনা স্বাস্থ্যবিধি নিষেধ মেনেই কর্মসূচি পালিত হয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) মুজফ্ফর আহমদ 'কাকাবাবু'-র জন্মদিন পালন করে সমগ্র রাজ্যজুড়েই। বর্ধমান জেলার ক্ষেত্রে হরেকৃষ্ণ কোঙার-এর জন্মদিন পালন করা হয়। মূলত পার্টি শিক্ষার কর্মসূচি হিসাবে এদিনও পালিত হয়েছে জেলার সর্বত্র। বুদবুদ ও গলসীতে কাকাবাবু ও হরেকৃষ্ণ কোঙারের জন্মদিন পালন করা হয়। তাঁদের আত্মদানের আলোকে কর্মী-সমর্থকদের নিকট ফ্যাসিবাদের বিপদকে প্রতিহত করার অনিবার্যতা বিষয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) নেতা সৈয়দ হোসেন। কালনা, গুসকরায় পালিত হয়েছে।

বিজ্ঞানকর্মীকে প্রাণনাশের হুমকি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : গত ৬ আগস্ট রামমন্দির ও রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে নিজস্ব অভিমত জানিয়ে ফেসবুকে একটি পোস্ট করেছিলেন গুসকরা এলাকার বিজ্ঞান কর্মী সৈকত গোলদার। 'রামভক্ত' একদল মানুষ হঠাৎ তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে, মারধর করে, এমনকি তাঁর প্রাণনাশের হুমকি দেয়। পরে সৈকত গোলদার সামাজিক নিরাপত্তা চেয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের জেলা কমিটির কার্যকরী সভাপতি চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদক আশুতোষ পাল পুলিশ সুপারের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করে আবেদন পেশ করেন। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক প্রদীপ মহাপাত্র এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে রাজ্যজুড়ে প্রতিটি গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে সোচ্চার হতে ও প্রতিবাদসভা সংগঠিত করার জন্য আবেদন জানান।

মেমারি-১ বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে চকদিঘি মোড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। বিজ্ঞানকর্মী সৈকত গোলদারের ফেসবুক পোস্ট করাকে কেন্দ্র করে তার উপর হামলার প্রতিবাদ জানানো হয়। এছাড়া করোনা প্রতিরোধে মানুষের মধ্যে সচেতনতা প্রচার করা হয়। কর্মসূচিতে অংশ নেন অমিত বিশ্বাস, তাপস পাল, ইন্তাজুল মণ্ডল, রঞ্জন কৈর্বত্য প্রমুখ। বর্ধমান শহরে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রচার করা হয়।

অকালে চলে গেল সিআইটিইউ কর্মী সন্তু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ আগস্ট : কোভিড আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন সি.আই.টি.ইউ ও ডাব্লু বি.এম.এ..আর.ইউ নেতা সন্তু দত্ত (৪০)। তিনি ডাব্লু বি.এম.এস.আর.ইউ সিং দরজা আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শহরে শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শোক প্রকাশ করেছেন সি.আই.টি.ইউ পূর্ব বর্ধমান জেলা সাধারণ সম্পাদক সুকান্ত কোঙার।

শহিদ স্মরণ কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৫ আগস্ট : পতাকা উত্তোলন, শহিদবেদিতে মাল্যদান, স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে কালনার দুই শহিদ পিনাকী চক্রবর্তী ও গফুর সেখকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয়। সিপিআই(এম)-এর কালনা শহর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এদিন গোপালবাড়ির সামনে এবং কালনা-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে শ্রীরামপুর ও বাঘনাপাড়া স্টেশনে পৃথকভাবে গফুর শেখের স্মরণানুষ্ঠান হয়। ১৯৭১ সালের ৫ আগস্ট সন্ধ্যায় অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র পিনাকী চক্রবর্তী টিউশনি পড়ে বাড়ি ফেরার পথে কালনা শহরের গোপাল বাড়ির কাছে আক্রান্ত হন। মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর মৃতদেহ উদ্ধার করে মর্গে নিয়ে যায় পুলিশ।

১৯৭১ সালের ৪ আগস্ট কংগ্রেসি গুণ্ডাবাহিনীর হাতে কালনার শ্রীরামপুর গ্রামে গফুর সেখ শহিদ হন। কৃষকনেতা প্রয়াত হরেকৃষ্ণ কোঙারের সহকর্মী শহিদ গফুর শেখের স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) নেতা শুকুল শিকদার, আলিম সেখ, বিকাশ নাথ, সামসের শেখ প্রমুখ। অন্যদিকে পিনাকী চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য পেশ করেন অরুণাভ চক্রবর্তী, মৈনাক চক্রবর্তী প্রমুখ।

৯ আগস্ট ভারত বাঁচাও, দেশ বিক্রি রুখে দাও কর্মসূচি পালিত জেলাজুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৯ আগস্ট : আজ ভারত ছাড়ো আন্দোলন দিবসের ৭৮তম বার্ষিকী উপলক্ষে 'ভারাত বাঁচাও দিবস'-এর আহ্বান ছিল বামপন্থী সহ ১১টি ট্রেড ইউনিয়ন ও ২৮টি ফেডারেশনের। গোটা দেশের সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও এক কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন বর্ধমান শহরে টেলিফোন ভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীরা। রেল সহ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। শ্রম আইন, সমকাজে সমমজুরি, আয়কর দেন না এমন পরিবার পিছু ৭৫০০ টাকা সহ বিভিন্ন দাবির শ্লোগান মুখরিত হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় কৃষক নেতা মদন ঘোষ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা অচিন্ত্য মল্লিক, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, শ্রমিক নেতা নজরুল ইসলামও তরুণ রায়, মহিলা নেত্রী গৌরী ব্যানার্জী, সুপর্ণা ব্যানার্জী সহ বিভিন্ন ট্রেডইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।

এদিন বর্ধমানে প্রয়াত শ্রমিকনেতা শ্যামল চক্রবর্তী ও মেডিক্যাল সেলস্ রিপ্রেজেনটেটিভ আন্দোলনের নেতা শান্তু দত্ত-কে স্মরণ করে রক্ত পতাকা অর্ধনমিত রেখে কার্জনগেট থেকে পার্কাস রোড পর্যন্ত একটি শোক মিছিল হয়। মিছিলের শেষে পার্কাস রোডে দুই প্রয়াত নেতার প্রতি শোক জানানো হয়।

দুর্গাপুরে দেশ বাঁচাও দিবস পালিত হয়েছে। এডিডিএ বিল্ডিং-এর সামনে দাবি সনদ উত্থাপন করে পথসভা হয়। পথসভা শেষে মিছিল হয়। বক্তব্য রাখেন বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী, বিশ্বরূপ ব্যানার্জী, উমাপদ দাশ প্রমুখ।

গুসকরা ও অভিরামপুরে শ্রমজীবী মানুষ মিছিল, পথসভা ও পথ অবরোধ করে। গুসকরা বাসস্ট্যান্ডের সামনে ও ভেদিয়া বাজারে অবরোধ হয়। দেবশালা, বননবগ্রাম, বেলারী প্রভৃতি এলাকায় মিছিল হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সুরেন হেমব্রম, আলমগীর মণ্ডল প্রমুখ।

গলসী স্টেশন, কুলগড়িয়া চটি ও খানাজংশনে দেশ বাঁচাও কর্মসূচি পালিত হয়। বক্তব্য রাখেন সৈয়দ হোসেন, সাইদুল হক, কাজি জাফর আলি, মুস্তাক হোসেন, নিখিল দত্ত, কেকা কাজি প্রমুখ। কর্পোরেট পুঁজি হটিয়ে দেশ বাঁচানোর কর্মসূচি পালিত হয় কালনা মহকুমা জুড়ে।

আবার ভাগচাষির মৃত্যু মন্তেশ্বরে

নিজস্ব সংবাদদাতা : আত্মঘাতী চাষির মিছিল থামছে না। মুখ্যমন্ত্রী যত বলছেন কৃষকদের আয় তিনগুণ করা হচ্ছে ততই চাষির মৃত্যু বাড়ছে। এবার আত্মঘাতী হলেন মন্তেশ্বরের অলোক হাজরা (৪২)। পরিবারের দাবি বোরো চাষে ১৫ বিঘা ভাগে চাষ করেন। ধার কর্জ করে চাষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধান নষ্ট হয়। লকডাউন শুরু হওয়ায় কাজ না থাকায় ধার শোধ করার কোনো উপায় না থাকায় মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। ৭ আগস্ট মাঠে যান ধান রোয়া দেখতে। ফিরে এসে ঘরের ভিতর গলায় ফাঁস দেন। বাড়ির লোক খাবার দিতে গিয়ে দেখেন ঝুলছে। এরপর ব্লক হাসপাতালে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ব্লক সহ-কৃষিঅধিকর্তা কনক দাসের দাবি মৃত্যুর কারণ চাষে লোকসান নয়। তাঁর মৃত্যু মানসিক অবসাদে। পঞ্চায়েত উপপ্রধান রফিকুল সেখ জানান, অলোকবাবু পেশায় ভাগচাষি ছিলেন। ঋণের দায়ে আত্মঘাতী কিনা জানা যায়নি। তদন্ত করে দেখা হবে।

লালঝাণ্ডার তলে আসা মানুষের ঢল অব্যাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৪ আগস্ট : লালঝাণ্ডার তলে আসা আজও অব্যাহত। পূর্বস্থলী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির বগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বচপুর গ্রামের দেড় শতাধিক পরিবার লালঝাণ্ডার তলায় ফিরে আসেন। যার মধ্যে অধিকাংশ পরিযায়ী শ্রমিক। গ্রামের মধ্যেই জমায়েত হয়ে তাঁরা ঘোষণা করেন সিপিআই(এম)-এর কর্মী হিসাবে তাঁরা কাজ করবেন। এই ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা। যে গ্রামে ২০১১ সালের পর লালঝাণ্ডা বহন করার মতো কোনো লোকজন ছিল না, সেই গ্রামেই এদিন জমায়েতের পর লালঝাণ্ডার মিছিল হয়। কেন এমন হল তা জানালেন গ্রামবাসীরাই। জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকৃত বন্ধুকে চিনিয়ে দিয়েছে। কিছু রেশন আর ভাষণ ছাড়া আর কিছুই পাননি তাঁরা। এই অবস্থায় তাঁদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছে—লালঝাণ্ডাই প্রকৃত বন্ধু হয়ে উঠতে পারে। গত জুন মাসে পূর্বস্থলীর দোগাছিয়ার গাগড়া গ্রামে মানুষের লালঝাণ্ডায় ফেরা শুরু হয়েছিল। তারপর নিমদহ, মন্তেশ্বরেও অন্য দল ছেড়ে লাল ঝাণ্ডার তলায় মানুষের ঢল নামে। সেই ঢল আজও অব্যাহত।

শ্যামল চক্রবর্তীর প্রয়াণে বর্ধমানে শোক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৭ আগস্ট : বাংলা ও দেশের ষাট সত্তরের দশকে উত্তাল ছাত্র-আন্দোলনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ও শ্রমিক আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতা শ্রমজীবী মানুষের আপনজন। 'শিশুতীর্থে শিশুরা' শীর্ষক পুস্তকের লেখক শ্যামল চক্রবর্তীর প্রয়াণে বর্ধমানে শোকের ছায়া নেমে আসে। জেলায় সর্বত্রই সিপিআই(এম) সহ বামপন্থী গণসংগঠন পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। বিভিন্ন জায়গায় অর্ধনমিত পতাকা নিয়ে শোক মিছিল হয়। সি.আই.টি.ইউ সহ সিপিআই(এম)-এর বিভিন্ন দপ্তরে প্রয়াত শ্যামল চক্রবর্তীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। সিপিআই(এম) মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটি আজ বামুনপাড়া মোড়ে শ্যামল চক্রবর্তী স্মরণে নীরবতা পালন ও শোকজ্ঞাপন করে।

অশোক ব্যানার্জীকে স্মরণ : বিশেষ সংখ্যা নতুন চিঠি

নতুন চিঠির প্রাণপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত অশোক ব্যানার্জীর স্মরণে এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। লিখেছেন— বিমান বসু, মদন ঘোষ, অরিন্দম কোঙার, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, আভাস রায়চৌধুরী, জহর মুখার্জী, মৃদুল সেন, সাইদুল হক, তাঁর দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত সচিব জ্যোতির্ময় ব্যানার্জী সহ প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বন্ধু ও আত্মজনেরা।

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০২০

প্রকাশিত হচ্ছে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে।

নবীন-প্রবীণের নব সৃষ্টিতে এবারেও সেরা সম্ভারে।

১৫ আগস্ট-এর মধ্যে আপনার লেখা পাঠাতে পারেন। সরাসরি অথবা ই-মেলে। তবে হার্ডকপি অবশ্যই পাঠাবেন।

কপি রেখে লেখা পাঠান। প্রবন্ধ বা গল্প যেন ১৮০০ শব্দের বেশি না হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

আমাদের mail id : weeklynatunchithi@gmail.co, dinesh.jha09@gmail.com

নতুন চিঠি

১০ আগস্ট, ২০২০

জয়যুক্ত হোক

করোনা মহামারিজনিত লকডাউনে দেশ গভীর সঙ্কটের মধ্যে। কাজ নেই অন্তত ২৪ কোটি মানুষের। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের ৩০-৩৫ শতাংশ কাজ শুরু করার অবস্থায় নেই। কারখানা খুললেও সবাইকে কাজে নেওয়া হচ্ছে না। মজুরি-বেতন কেটে নেওয়া হচ্ছে। লকডাউনের সময়ের বেতন দেওয়া হচ্ছে না। বেকারির হার চড়া। ৪০ কোটি মানুষ তীব্র দারিদ্রের মধ্যে পড়তে চলেছেন। মোদি সরকার কোনো ব্যবস্থাও নিচ্ছে না। মোদি সরকার শুধু কর্পোরেট এবং বড় ব্যবসায়ীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। রেল, প্রতিরক্ষা, ব্যাঙ্ক, বিমা, টেলিকম, ডাক এবং অন্যান্য সেক্টরে যাঁরা এই লকডাউনের সময়ে জরুরি পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁদের সমস্যাগুলি সম্পর্কে সরকার উদাসীন। ২ মাসে ২২ বার পেট্রোপণ্যের দাম বাড়ানো হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে চড়া হারে। দেশের নিরাপত্তা লাটে। প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে অবাধে বিদেশি বিনিয়োগ। ৪১টি অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। বিক্রি হচ্ছে রেল। ১৫১টি ট্রেন বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। মহামারি মোকাবিলায় মোদি সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। গুরুত্বপূর্ণ ৪ মাস নষ্ট করেছে। অপরিকল্পিত লকডাউন ঘোষণার ফলে শ্রমজীবীরা তীব্র দুর্দশার মধ্যে পড়েছেন। দীর্ঘ এই লকডাউনের মধ্যেও সরকার স্বাস্থ্যব্যবস্থার কোনো উন্নতি করেনি। ফ্রন্টলাইন কর্মীদের জন্য সুরক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করতে পারেনি। শ্লোগানসর্বস্ব আত্মনির্ভরতার নীতি দেশ বিক্রির।

শুরু থেকেই বিজেপি সরকারের চেষ্টা ছিল মহামারিকে ব্যবহার করে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে খতম করা, রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজ কর্মীদের লক্ষ্য করে আক্রমণ শানানো ও বিরোধীদের পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলিকে পাল্টানো। বিজেপি-র এই অপচেষ্টা অত্যন্ত নিন্দনীয়। দেশের মূল ভিত্তি রেল-প্রতিরক্ষা-বিমা সহ বন্দর, কয়লা, এয়ার ইন্ডিয়া, ব্যাঙ্ক, মহাকাশ বিজ্ঞান এবং পারমাণবিক শক্তি ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে অথবা ১০০ শতাংশ এফডিআই-এর জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে। তাই সারা ভারত যুক্ত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয়েছেন সমস্ত স্তরের শ্রমজীবী মানুষ। মানুষের এই প্রত্যয় জয়যুক্ত হোক।

তাঁতশিল্পীর মেয়ে তৃষার স্বপ্ন ডাক্তার হওয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩ আগস্ট : স্রেফ একজন তাঁতশিল্পীর মেয়ে তৃষা বসাক এবার মাধ্যমিকে ভালো ফল করেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা থানার ধাত্রীগ্রাম বিবিরজোলের মেয়ে তৃষা বসাক মাধ্যমিকে ৬৬২ পেয়েছে। বিষয়ভিত্তিক নম্বর হল বাংলা-৯৬, ইংরাজি-৯০, অঙ্ক-৯৫, পদার্থ বিজ্ঞান-৯২, জীবন বিজ্ঞান-৯৪, ইতিহাস-৯৫, ভূগোল-১০০। ধাত্রীগ্রাম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের এই ছাত্রীর ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ডাক্তার হওয়া। সেই স্বপ্ন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ভালো পড়াশুনা করে মাধ্যমিকে সে ভালো ফল করেছে। সে জীবনের প্রথম থেকেই সব ক্লাসেই প্রথম হয়ে এসেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁত শিল্পের যা অবস্থা তাতে এই শিল্পের সাথে যুক্ত মানুষজনের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। আর তৃষার বাবা জয়ন্ত বসাকের মতো তাঁতশিল্পীদের অবস্থা আরো সঙ্গীন। তৃষাদের সংসার চালানোটাই বর্তমানে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে। আর্থিক কারণেই তৃষা বসাকের ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নটাই এখন সংকটের মুখে। এমতাবস্থায় তৃষা বসাকের ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন সফল করতে পারে কোনো সহৃদয় ব্যক্তি বা সংস্থার আর্থিক সাহায্য। আর্থিক সাহায্যের জন্য যোগাযোগ—৯০৯৩৬৬১০৬৫।

বিকল্প কাজের দাবিতে বিক্ষোভ রেল হকারদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ আগস্ট : কাজ হারানো রেল হকাররা বিকল্প কাজের দাবিতে কালনা শহরে বিক্ষোভ দেখালেন। সি.আই.টি.ইউ অনুমোদিত রেল হকার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে সিদ্ধেশ্বরী মোড়ে এদিনের বিক্ষোভে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা অরুণাভ চক্রবর্তী, সঞ্জিত মুখার্জী প্রমুখ। লকডাউন উঠে যাওয়ার পর ট্রেন চলাচল শুরু হবে। কিন্তু রেল হকাররা যাতে নিজের কাজে ফিরতে না পারে, তার পাকাপাকি ব্যবস্থা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সরকার রেল বেসরকারিকরণ করে রেল হকারদের মতো গরিব মানুষের জীবিকা বন্ধ করে দিয়ে পুঁজিপতিদের ব্যবসা করে দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। তাই বিপুল সংখ্যক মানুষের রুজি রোজগার বন্ধ করার ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে। পাশাপাশি রেল বেসরকারিকরণ হলে সাধারণ মানুষের উপর বাড়তি বোঝা চাপবে। তাই রেল কোনোভাবেই বেসরকারিকরণ করা যাবে না। হকারদের রেলেই হকারি করতে দিতে হবে। রেল হকারদের এই কর্মসূচিতে কালনা শহরের সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে বিরাট প্রভাব পড়ে।

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ : একটি পর্যালোচনা

সেখ সাইদুল হক

প্রেক্ষাপট :

জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া রূপরেখা প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১৬ সালে। নাম ছিল 'Some Inputs of Draft National Education Policy'। ওই রূপরেখা তৈরি করেন প্রাক্তন ক্যাবিনেট সচিব টি.এম.আর. সুব্রহ্মণ্যম-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি। ওই খসড়া রূপরেখা নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। ওই খসড়া সংসদের উচ্চকক্ষে ১১ আগস্ট, ২০১৬-তে উপস্থাপিত হলে সেখানে প্রায় সমস্ত বিরোধী দল আপত্তি জানায়। সেই পটভূমিতে ২০১৭ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের মানসবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ইসরোর প্রাক্তন প্রধান ডাঃ কে কস্তুরীরঙ্গনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। সেই কমিটি প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা দেয় ২০১৯ সালের ৩১ মে। কেন্দ্রীয় সরকার ১ জুন, ২০১৯ তারিখে তা সর্বসমক্ষে এনে মতামত চায়। প্রচুর মতামত জমা পড়ে। সেই সব মতামতকে অগ্রাহ্য করে, সংসদে কোনোরূপ আলোচনা না করে এবং রাজ্যগুলির সাথে পরামর্শ না করে কেন্দ্রীয় সরকার একতরফাভাবে গত ১৯ জুলাই, ২০২০ জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছে। অথচ শিক্ষা আছে সংবিধানের যুগ্ম তালিকায়। কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষানীতি রচনায় কিছু বাছাই করা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে ডেকেছে আলোচনার জন্য যারা বেশিরভাগই সরকারি আনুকূল্যে ধন্য। আর ছাত্র ও শিক্ষক সংগঠনগুলির মধ্যে কেবল ডেকেছে বিজেপির ছাত্র সংগঠনকে। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না কোন স্বার্থে এই শিক্ষানীতি রচিত হয়েছে। ৪৮৪ পাতার রিপোর্টটি চারটি ভাগে বিভক্ত— (১) বিদ্যালয় শিক্ষা, (২) উচ্চশিক্ষা (৩) কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র (৪) শিক্ষার পুনর্গঠন। এর মধ্যে 'বিদ্যালয় শিক্ষা' এবং 'উচ্চশিক্ষা' ক্ষেত্রে কী কী প্রস্তাব করা হয়েছে তার কিছু কিছু উল্লেখ করে সামগ্রিক শিক্ষানীতির পর্যালোচনায় কিছু অভিমত এখানে রাখতে চাইছি। প্রথমেই বলে রাখি 'মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক'-এর বদলে 'শিক্ষা মন্ত্রক' নাম ফিরিয়ে আনতে চাওয়া হয়েছে।

'বিদ্যালয় শিক্ষা' নিয়ে কী বলা হয়েছে :

বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে বর্তমান প্রচলিত ১০+২ ব্যবস্থাকে ভেঙে ৫+৩+৩+৪ কাঠামোয় করা হবে। অর্থাৎ তিন বছরের প্রাক প্রাথমিকের সাথে প্রাথমিকের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি নিয়ে ৫ বছরের ভিত্তি স্তর, তৃতীয় শ্রেণি হতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ৩ বছরের প্রস্তুতি স্তর; ষষ্ঠ শ্রেণি হতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ৩ বছরের মধ্যস্তর; নবম শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ৪ বছরের মাধ্যমিক স্তর। বিদ্যালয়শিক্ষার সময়সীমা হবে ১৫ বছর।

বিদ্যালয় পরীক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত 'না আটকানো'। তবে শিক্ষানীতির অগ্রগতি বুঝতে তৃতীয় শ্রেণি, পঞ্চম শ্রেণি ও অষ্টম শ্রেণিতে রাজ্যগুলি মূল্যায়ন পরীক্ষা (State census Examination) করবে। নবম হতে দ্বাদশ পর্যন্ত ছয় মাস অন্তর ৮টি সেমিস্টার হবে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির গাইডলাইন মেনে। বলা হয়েছে তিন কিমি ব্যাসার্ধে একটি উচ্চ বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে সবধরনের বিদ্যালয়গুলিকে নিয়ে বিদ্যালয় গুচ্ছ গড়ে তোলা হবে। শিক্ষার্থী ৫০-এর কম এমন বিদ্যালয় সংযুক্ত করা হবে। বিদ্যালয়গুলিতে মিড-ডে-মিলের ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি প্রাথমিক স্তরে প্রাতরাশের ব্যবস্থা লাগু করতে হবে। রিপোর্টে বলা হয়েছে বিদ্যালয় স্তর হতেই ভোকেশনাল শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। পেশাগত প্রশিক্ষণ-দক্ষতা বাড়াতে প্রত্যেক শিক্ষককে বছরে কমপক্ষে ৫০ ঘন্টার ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত হবে ৩০ : ১। টেস্ট পরীক্ষায় ক্লাস ডেমো থাকবে। ২০২২ সালের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাঠদান পারদর্শিতা পরিমাপ করার জন্য পদ্ধতি তৈরি করা হবে। মুনাফার জন্য নয় এমন বেসরকারি স্কুলগুলির জন্য শিক্ষা আইন মোতাবেক পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য ২৫ শতাংশ সংরক্ষণ শিথিল করা হবে।

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত (সম্ভব হলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা বা স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষা। ইংরাজির ভার কমানো হবে। আবার বলা হয়েছে ত্রিভাষা সূত্র লাগু করা হবে। ষষ্ঠ শ্রেণি হতে ইংরাজি চালু হবে। মাতৃভাষা ও ইংরাজির পাশাপাশি অহিন্দিভাষী এলাকায় হিন্দি ভাষা এবং হিন্দিভাষী এলাকায় একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা থাকবে। বিদ্যালয়স্তর হতেই সংস্কৃত ভাষার উপর জোর দেওয়া হবে, কেননা সংস্কৃত ভাষা ধ্রুপদী ও আধুনিক।

বিদ্যালয়স্তরের শিক্ষা হতেই ডিজিটাল লার্নিং বা অনলাইন শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হবে। ২০২২ সালের মধ্যে সমস্ত বিদ্যালয়গুলিকে বিদ্যুতায়ন করে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। ২০২০ সালের মধ্যে ২০০৫ সালের জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখাকে সংস্কার করে প্রাচীন ভারতের আর্য বৈদিক যুগের দর্শন, গণিত ও যোগশিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের মূল বিষয়গুলি কী কী?

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তিন বছরের স্নাতকের মাঝে এক বছরের বি.এড.কে জুড়ে দিয়ে চার বছরের ইন্টিগ্রেডড কোর্স চালু করা হবে। উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হবে : (১) গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় (যেখানে গবেষণামূলক কাজ হবে), (২) শিখন বিশ্ববিদ্যালয় (যেখানে কেবল পড়াশুনার কাজ হবে) (৩) স্বশাসিত কলেজ প্রতিষ্ঠান। পৃথক পৃথক অসংখ্য ছোট ছোট কলেজের পরিবর্তে ৩ হাজার বা তার বেশি শিক্ষার্থী নিয়ে গড়ে ওঠা কলেজগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হবে। কলেজগুলি স্বশাসিত হবে এবং ন্যাকের যোগ্যতামান অনুযায়ী স্বাধীনভাবে ডিগ্রিদান করা কলেজে রূপান্তরিত হবে। কোন এফিলিয়েটেড কলেজ থাকবে না। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মুক্ত ও দূরশিক্ষার উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে Massive Open Online Course-এর মাধ্যমে অনলাইনে বেশি করে কোর্স চালু করা হবে। কমিটির প্রস্তাব উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হয়েছে বর্তমানে ২৫ শতাংশ হতে বাড়িয়ে ২০৩৫ সালে ৫০ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে। তাই উচ্চশিক্ষায় নিয়ন্ত্রণ সংখ্যা কমিয়ে ইউ.জি.সি এবং এ.আই.সি.টি-এর পরিবর্তে National Higher Education Regulatory Authority তৈরি করা হবে। এরা স্বাধীন ভাবে কাজ করবে। নতুন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ক্ষেত্রে সংসদ বা বিধানসভার অনুমোদন প্রয়োজন নেই। NHERA-র অনুমোদন নিয়ে এন.সি.টি.ই. যোগ্যতামান অর্জন করলেই যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কলেজ খুলতে পারবে। ১০০টি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়কেও ভারতে ক্যাম্পাস খোলার অনুমতি দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ভারতে এখন সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে আট শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়, প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার মহাবিদ্যালয় এবং বারো হাজারের বেশি প্রযুক্তি, কারিগরি বা চিকিৎসাবিজ্ঞান ধরনের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, এগুলিতে সব মিলিয়ে ৩ কোটির বেশি ছেলে-মেয়ে পড়ে। ফলে ভারতের শিক্ষা বাজার বেশ বড়।

উচ্চশিক্ষার মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচের কথা বলা হয়েছে। অঙ্ক বিজ্ঞানের সাথে সাহিত্য সঙ্গীত বা কলা বিদ্যার সাথে বিজ্ঞান পাঠ নেওয়া যাবে। অর্থাৎ লিবারেল স্টাডিজ পাঠক্রমকে মূলমন্ত্র করা হচ্ছে যার আদি মডেল হলো আমেরিকার প্রাক্‌স্নাতক ব্যবস্থা। বলা হয়েছে এম.ফিল তুলে দেওয়া হবে। গবেষণার জন্য স্বশাসিত National Research Foundation গড়ে তোলা হবে। কম্পিটিটিভ ফান্ডিং-এর মাধ্যমে বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও সাহায্য দেওয়া হবে। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীরা স্পেশালাইজেশনের ক্ষেত্রে একটিকে মেজর এবং অপরটিকে মাইনর বিষয় হিসাবে বেছে নেবে। শিক্ষার্থীদের বিষয় নির্বাচন ও বর্জনের অধিকার থাকবে। কোনো শিক্ষার্থী চাইলে তিন বছরের স্নাতক হতে পারে। সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা দেওয়া হবে। কিন্তু এগুলির কী মূল্য থাকবে তা অবশ্য বলা নেই। বলা নেই এতে উচ্চশিক্ষার গুণমান বাড়বে না কমবে।

একটি পর্যালোচনা :

এখন যদি আমরা ঘোষিত শিক্ষা নীতির পর্যালোচনা করি তাহলে প্রথমেই বলতে হয় ১৯৮৬ সালের পর ৩৪ বছর বাদে নতুন একটি শিক্ষানীতি রচিত হল, অথচ এর কোন দিশা নেই। পূর্বের শিক্ষানীতির সাফল্য-ব্যর্থতার কোনো মূল্যায়ন নেই। সাক্ষরতা মিশনের এবং জাতীয় পাঠক্রমের কোনো মূল্যায়ন নেই। দেশের ৩০ কোটির বেশি নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করার কোনো পরিকল্পনা নেই। যেভাবে শিক্ষানীতি রচিত হয়েছে তাতে শিক্ষা পণ্যে পরিণত হবে। আসলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও গ্যাট চুক্তিকে বিবেচনায় রেখে এই শিক্ষানীতি রচিত হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষানীতিতে পড়ুয়াদের আত্মনির্ভর স্বাধীন এবং স্বাভিমানী করে তোলার নামে যেভাবে প্রাচীন বৈদিক যুগের শিক্ষার গৌরবগাথা করা হয়েছে তাতে এটা স্পষ্ট শিক্ষানীতি রচনায় আর.এস.এস-এর ধ্বনি প্রতিফলিত হয়েছে। আর গোটা শিক্ষানীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ (RSA) গঠন করা হবে তাতে শিক্ষার কেন্দ্রীকরণ হবে। অর্থাৎ এই শিক্ষানীতি শিক্ষার বাণিজ্যিকীরণ, কেন্দ্রীকরণ এবং সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটাবে। কেন এই শিক্ষানীতি বাতিল করা দরকার তা কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনা করলেই পরিস্ফুটিত হবে।

বিদ্যালয় শিক্ষার এই কাঠামো বিন্যাস কতটা বাস্তবসম্মত। প্রাক্ প্রাথমিকের নামে তিন বছরের শিশুকে বিদ্যালয় শৃঙ্খলায় বেঁধে ফেলা এবং প্রাথমিকের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিকে প্রাক্ প্রাথমিকে যুক্ত করা একটি জগাখিচুড়ি অবস্থা তৈরি করবে। কোথায় যাবে এরা? অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির বা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সেই পরিকাঠামো বা ওই ধরনের প্রশিক্ষণ শিক্ষক-শিক্ষিকা নেই। ফলে দুটোই মার খাবে। তৃতীয়, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির স্টেট সেনশাস পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা ও কার্যকারিতা কী হবে বলা নেই। নবম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর করে উচ্চমাধ্যমিক তুলে দিয়ে কী লাভ হবে? যেসব স্কুলে এখন একাদশ ও দ্বাদশ নেই তাদের পরিকাঠামো ও শিক্ষক নিয়োগের কী হবে? মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার গুরুত্ব আলাদা। সেটাকে কার্যত তুলে দিতে চাওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির গাইডলাইনে যে ৮টি সেমিস্টারের কথা বলা হয়েছে তাতে টেস্টিং কোচিং সেন্টার বাড়বে। শহর, শহরতলি, গঞ্জগুলিতে এখন কিন্ডারগার্টেন, প্রি-স্কুল ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়েছে। বেড়েছে কোচিং সেন্টার। বর্তমান নীতিতে তা আরও বাড়বে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য তৈরি

—এরপর চারের পাতায়

এক হার না-মানা মানুষের কথা

গীষ্পতি চক্রবর্তী

১৯৮১ অথবা ১৯৮২ সাল নাগাদ অশোকদা (অশোক ব্যানার্জী)-র সঙ্গে পরিচয় হয় আমার। পরিচয় কিভাবে, কোথায় হয় তা মনে পড়ে না। তখন আমি ছাত্র। আমার সঙ্গে ওনার পরিচয় করিয়ে দেন আমার এক সহপাঠী। বর্ধমানের অনেক সর্বজনশ্রদ্ধেয় মানুষদের একজন অশোকদা। বর্ধমান শহর ও গ্রামের বহু গুণী মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয় সে সময়ে। এঁদের মধ্যে নিরুপমদা (নিরুপম সেন) ও মদনদা (মদন ঘোষ), সুভাষদা (সুভাষ চ্যাটার্জী) ও আরও অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় নানা কাজের মাধ্যমে। 'নতুন চিঠি' পত্রিকার সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হওয়ার সুবাদে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, জহুরদা (জহুর আলম) ও দিনেশ (দিনেশ ঝা) ও আরও অনেকের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে। বর্ধমান শহর, গ্রামকেন্দ্রিক নানা কর্মকাণ্ডে এইসব গুণীজনের মধ্যে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব অশোক ব্যানার্জী, 'নতুন চিঠি'-র প্রাণপুরুষদের একজন। হাজার কাজের মধ্যে ওনাকে দেখেছি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন একসময়ে। চাকরি ছেড়ে দেন মাঝপথে। ওখানেও নানা কর্মকাণ্ডে উনি ছিলেন সচল ব্যক্তিত্ব। অবাক হয়েছিলাম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মঞ্চে ওনাকে দেখে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সময়ের কর্মসমিতির মৃদুলদা (মৃদুল সেন) ও দিলীপদা (দিলীপ দুবে)-র অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন উনি। ওনাদের নানা কাজে দেখেছি, পারস্পরিক বন্ধুত্ব, ভালোবাসার বন্ধনে। যে বন্ধনের উপস্থিতি বর্তমানে অনেকটাই কম। হয়তো এই যুগের পারস্পরিক সম্পর্কের নিরিখে ওনাদের সম্পর্কের গভীরতা মাপা ঠিক হবে না। এই ব্যাপারটা অন্য আলোচনায় ভূমিকা হতে পারে।

বহু মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের আলোয় অশোকদাকে না দেখলে, বহু কাজের মধ্যে দিয়ে ওনাকে না দেখলে, দেখাটা হয়তো সঠিক হবে না। বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ওনার জীবনের এক বিরাট ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। এই কর্মকাণ্ডে চলার পথে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝায় গৌরীদি (গৌরী ব্যানার্জী, ওনার সহধর্মিনী) ওনার নিত্যসঙ্গী ছিলেন। সময় অশোকদাকে নিয়ে চলে গেছে অজানা জগতে। জীবনের মাঝপথে ওনারা হারিয়েছেন ওনাদের একমাত্র মেয়েকে। জীবনের ওই কঠিন সময়ে ওনাদের দেখেছি ধীর-স্থির। বেদনাকে নিজেদের মধ্যে ধরে রেখেছেন ওই কঠিন সময়ে। এখন একা লড়াই করে চলেছেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় গৌরীদি। এখনও হাসিমুখে মানুষের লড়াইয়ের মাঝে নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে চলেছেন উনি।

সুভাষপল্লীতে অশোকদাদের বাড়ি ছিল। সে বাড়ি ছেড়ে ওনারা চলে গিয়েছিলেন সর্বমঙ্গলাপাড়ায় বাঁকানদীর ধারে একটি বাড়িতে। ওখানে থাকতে থাকতে বয়সজনিত কারণেও দীর্ঘদিন ডায়াবেটিসে ভোগার কারণে অশোকদা বারে বারে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। গৌরীদি ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীদের সেবা যত্ন পেয়েছেন অশোকদা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। জীবনের শেষ কটা দিন ওনার কেটেছে নার্সিংহোমে, অর্ধচেতনায়। করোনা আবহে মানুষের যাতায়াতে বিধিনিষেধ ছিল অনেক। ফলে মানুষের ঢল নামেনি সেখানে। মৃত্যুর পরেও সীমিত মানুষের উপস্থিতিতে ও সহযোগিতায় ওনার দেহ চলে গেল বর্ধমান মেডিকেল কলেজে। মৃত্যুর পরেও নিজেকে বিলিয়ে দিলেন; সে ব্যবস্থাপনা করে গিয়েছিলেন। প্রচারবিমুখ একজন লড়াকু মানুষ চলে গেলেন প্রায় নীরবে। যখন মাঝে মাঝে ওনাকে দেখতে যেতাম, কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে বলতেন—তোমাকে বিরক্ত করছি বারে বারে। অবাক হতাম। আমারা জানাতাম, উনি বলামাত্র বহু মানুষ বিনাপ্রশ্নে চলে আসবে ওনার কাছে। আজকের সমাজের আশ্চর্য আত্মকেন্দ্রিকতার ব্যাপ্তির বিপরীতে সেইসব মানুষেরা নীরবে ওনার পাশে থাকার চেষ্টা করেছে, যাঁরা ওনাকে কাছে থেকে দেখেছে, প্রভাবিত হয়েছে ওনার আদর্শের দ্বারা।

আমাদের পঠন-পাঠনের অঙ্গ হিসাবে গ্রামে কিছুদিন থেকে গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানা তথ্য সংগ্রহ, কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি সঞ্চালিত হচ্ছিল বর্ধমান মেডিকেল কলেজের তত্ত্বধানে। কলেজের এন.এস.এস ইউনিটও যুক্তছিল এই কাজের সঙ্গে। বর্ধমানের বোহার অঞ্চলে, বড়েঞা গ্রামের পঞ্চায়েত কার্যালয়ে আমরা থাকতাম। প্রায় সাত দিন আমরা ঘরে ঘরে গিয়ে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত তথ্য জোগাড় করতাম। আমরা যেখানে কাজ করতাম, তার কাছেই ছিল শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ-এর কাজের ক্ষেত্র। এই কো-অপারেটিভের কাজের সঙ্গে ছিল অশোকদার নিবিড় যোগাযোগ। সে সময়ে ওই সমবায়ের কাজ চলছিল অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে। এই সাফল্যের পেছনে অশোকদার ভূমিকা ছিল বলবার মতো। উনি নিজমুখে কোনোদিন

বলেননি এসব কথা। আমরা জেনেছি অন্য অনেকের সঙ্গে আলাপচারিতায়। আড়ালে থেকে কাজ করার অসামান্য ক্ষমতা ছিল ওনার। পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনের সামনের সারির পথপ্রদর্শক ছিলেন অশোক ব্যানার্জী। সমবায়ের কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা ওনাকে চেনে একডাকে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা ভালোভাবে বলতে পারবেন ওনার কার্যপরিসর। ওই কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কোনো সুযোগ ছিল না আমাদের। ফলে দূর থেকে শুনে যতটুকু বুঝেছি, তা থেকে বলা যায়, বিভিন্ন সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের ভরসার জায়গা ছিলেন উনি।

বামপন্থী রাজনীতির অঙ্গনে অশোকদার ছিল স্বচ্ছন্দ চলাচল। বহু সময়ে নতুন চিঠি পত্রিকা অফিসে ওনার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো। পত্রিকা পরিচালনায় জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, ও আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় দেখেছি ওনাকে। কখনো জটিল দার্শনিক তত্ত্বের গভীর আলোচনায় ওনাকে খুব একটা কথা বলতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তবে অল্প কথায় মত প্রকাশের ক্ষমতা, সকলকে যথাযথ সম্মান দিয়ে কথা বলায় পটু ছিলেন উনি। দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাওয়ার অসামান্য ক্ষমতা ছিল ওনার। শুনেছি জেলে থাকার সময়ে, রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে উনি অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। রাজনীতির কথা উঠলেও, নিজের জেলের অভিজ্ঞতার কথা কখনও সোচ্চারে বলতে শুনিনি। মানুষের ওপর আস্থা হারানো ঠিক নয়, খুব মৃদুভাবে এইটুকুই কথা বলতেন, কেউ ধৈর্য্যচ্যুত হলে। এতকিছু করলেন, কি হল? এমন প্রশ্নে ওই একটি উত্তরই দিতে শুনেছি ওনাকে।

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক কৃষ্টির প্রেক্ষাপটে বলা যায়, অশোকদার মতো মানুষেরা সেইসব বিরল প্রজাতির প্রতিনিধি, যারা রাজনীতি থেকে নাম, যশ, প্রচার, কাগজে, টিভিতে মুখ দেখানোর নতুন ধারার সঙ্গে বেমানান। রাজনীতির যে ঘরাণা অশোকদা ও ওনাদের মতো মানুষেরা তৈরি করেছিলেন, বর্তমান প্রজন্ম হয়তো তার সঙ্গে সেভাবে পরিচিত নয়; হয়তো নতুন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি উঠে আসছে, যা পুঁজিবাদের ভোগসর্বস্ব জীবনধারাকে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে চাইছে ও মানুষকে ভোগসর্বস্বতার ঘূর্ণাবর্তে টেনে নিতে চাইছে। দলগত রাজনৈতিক ধারাকে দূরে সরিয়ে রেখে এটুকু বলা যায়, বাম-রাজনীতি ও বাম-বিরোধী রাজনীতির প্রবক্তা, সকলের কাছেই অশোকদাদের রাজনৈতিক ঘরাণা ভাবনার উদ্রেক করবে। যেকোনো রাজনৈতিক দল তাদের কর্মকাণ্ড রূপায়ন করে মানুষের হাত দিয়েই। মানুষের জন্য কাজ করার পদ্ধতি প্রকরণ কেমন হওয়া উচিত তা হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন অশোকদার মতো মানুষ। এই সময়ের আর্থ-সামাজিক অনিশ্চয়তার মধ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ধীর স্থির থেকে আগামীদিনের কাজ কিভাবে করতে হয় তা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়েছেন উনি। ভবিষ্যতের কাজ খুব সরবে হয় না। এক নীরব কর্মধারা সেই কাজের পদ্ধতি। যারা সাহসে ভর করে সেই কাজে নিজেদের প্রয়োগ করতে পারবেন, তারা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন অশোকদার কাজের ধরণ।

রাজনৈতিক মতাদর্শে যারা বিরোধী, তাদেরকেও দেখেছি ওনাকে শ্রদ্ধা করতে। ব্যক্তিগত সমালোচনা করতে শুনিনি কখনো ওনাকে। সাহায্যের হাত বাড়াতে উনি কখনো রাজনৈতিক দলের পরিচয়কে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না।

ডায়াবেটিসের কারণে ধীরে ধীরে চোখের ক্ষমতা কমেছিল অনেকটা। চিকিৎসার সমস্ত নিয়ম ঘড়ি ধরে মেনে চলতেন। খাওয়া ছিল চিকিৎসা-বিধি মেনে। শত অনুরোধেও বিচ্যুত হতেন না নিয়ম থেকে। কিডনির সমস্যাও ছিল কিছুটা। এই সবকিছু নিয়েই কাজের ধারায় নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। কখনও আক্ষেপ করেননি। শরীরের সীমাবদ্ধ ক্ষমতাকে টপকে মনের জোরে চালিয়ে নিয়ে গেছেন নিজেকে। গড়পড়তা জীবনের ছাঁচে ফেলা যাবে না ওনাকে। সমাজ যা কিছু চাপিয়ে দেয় আমাদের মনে, আমরা বেশিরভাগ মানুষ তাইই মেনে নিই। ভাগ্য শব্দটা বেশিরভাগ মানুষকে ভাবনার, চিন্তার, বিশ্লেষণের শ্রম থেকে দূরে রাখে। চিন্তার জগতে কঠোর শ্রমের ক্লান্তি কাবু করতে পারেনি ওনাকে। ভাগ্যের হাতে সঁপে দেওয়ার চিরাচরিত ধারণার বিপরীতে ছিল ওনার অবস্থান, শেষ দিন অবধি।

হয়তো কিছু মানুষের মন ওনাকে মেনে নিতে পারেনি। জীবনের এই রূঢ় বাস্তবতা মানতে অনেকের কষ্ট হয়। ভাগ্যকে আশ্রয় করে একরকমের এলোমেলো চিন্তায়, অনিশ্চিতের বাস্তবতাকে এই সমাজের ঘোর এক অসুখ হিসাবে না দেখে একরকম করে জীবন কাটায় বেশিরভাগ মানুষ। এরই মাঝে কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে নিজেদের সঁপে দিচ্ছেন অশোকদারা। অনেকের কাছে এইসব মানুষেরা দূরের মানুষ। বহু যুগ ধরে এঁরা একধরনের অবহেলাকে মেনে নিয়েছেন। যদিও এঁদের শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় মনে রেখেছেন অনেকে। এই সংখ্যার হিসাবটা আজ গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের জন্য যে স্বাধীনতার কথা বলতে ভালোবাসতেন অশোকদা, সে কথা শোনবার, বুঝবার, বিশ্বাস করার মানুষের সংখ্যা যত বাড়বে ততই স্বাধীন জীবনের সুদিনের কাছে হয়তো পৌঁছে যাব আমরা; বাস্তবে কি হবে, তা অনেক যদি, কিন্তু, জটিল হিসাব-নিরাশের ওপর নির্ভর করে। ভবিষ্যৎবাণী এই আলোচনার পরিসরের বাইরে। অশোকদারা একভাবে চেষ্টা করে গেলেন। নতুন প্রজন্ম হয়তো নতুনভাবে কিছু ভাবছে। ভাবনার বীজ ছড়িয়ে গিয়েছেন যাঁরা, তাঁরা দূরে চলে গেলেও, নতুন চারা বেরোবেই এটুকু জোর দিয়ে বলা যায়। প্রকৃতির নিয়মেই এই ঘটনা ঘটবে।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন শ্রমজীবী মানুষ

জলেশ্বর পাত্র

তৃণমূল-বিজেপি সরকারের চালাকি ধরে ফেলেছেন কৃষক, খেতমজুর ও দেশের সাধারণ মানুষ। একজন সারদা আর নারদায় গরিব মানুষের টাকা লুট করে এখন মুখে বড় বড় ভাষণ দিচ্ছে আর অন্যজন দেশের মানুষকে বোকা ভেবে দেশটাকে নিয়ে ছেলেখেলা শুরু করেছে। গ্রাম থেকে শহরের সাধারণ শিক্ষিত এবং লেখাপড়া না জানা মানুষেরা বিরক্ত শুধু নয় ক্ষোভ উগরে দিচ্ছে দিদি আর মোদির বিরুদ্ধে। লুকোছাপা নয় খোলাখুলি এই দুই দলের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। নোটবন্দি, নারদা সারদার কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে এই লকডাউন পিরিয়ডে এদের শুধু চিনে ফেলেছেন তাই না এই দুই দলের মধ্যে যে গোপন গাঁটছড়া বাঁধা আছে, সেটাও পশ্চিমবঙ্গের আপামর মানুষের কাছে পরিষ্কার।

বামফ্রন্টের নামে অপপ্রচার করে গরিব মানুষকে ভুল বুঝিয়ে আর ভোটের সময় টাকা আর ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছে সেটা এখন মানুষের কাছে পরিষ্কার। এই দুঃসময়ে আমফান ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত মানুষদের টাকা লুট করছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানো তো দূরের কথা তাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে।

এখন মানুষ বুঝে নিয়েছেন যে ভোট এলেই দুই দল বড় লাফালাফি শুরু করে দেয়। এই করোনা আবহে যখন খেটে খাওয়া মানুষের সামনে অন্ধকার নেমে এসেছে, কোনো কাজ নেই, খাবারের ব্যবস্থা নেই, ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা তুলে দিয়ে মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পয়সার অভাবে ভাতের সঙ্গে তরকারি জুটছে না, জ্বর হলে ওষুধ কেনার পয়সা নেই তখন দেশের মোদি সরকার বড় বড় নামকরা সম্পত্তিকে বেচে দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বিলাসিতা করে বিমান কেনার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা দেশের কোষাগার থেকে নষ্ট করছে। অথচ গরিব মানুষদের একাউন্টে মাসে মাসে এই কঠিন সময়ে অর্থ সাহায্য করে তাদের খানিকটা সহযোগিতা করার কোনো দায় নিচ্ছে না।

আবার ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে দেশের মানুষের নজর অন্যদিকে ঘোরাতে চাইছে। এই সময় কৃষক খেতমজুরদের অবস্থা আরও সঙ্গীন। কৃষকের ফসলের সঠিক দাম নেই, চাষ করার খরচ দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ-ডিজেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় আরো সংকটে পড়েছেন তারা। গ্রামের খেতমজুররা আরো কঠিন অবস্থার সামনে পড়েছেন। নিজের শরীরটাই যাদের আসল সম্পদ, যে শরীর শুধু খাটতে চায়, সেই শক্ত শরীর এই লকডাউন সময়ে শেষ হতে চলেছে। সেই খেটে-খাওয়া ঘরের মানুষেরাও তৃণমূল বিজেপির লোক ঠকানো কারবার ধরে ফেলেছেন।

তাই লাল পতাকার তলে ভিড় বাড়ছে খেটে-খাওয়া মানুষের। ভিড় বাড়ছে বেকার যুবক যুবতীদের। শ্রমজীবী মানুষের ভিড়ে বিশাল হচ্ছে পূর্ব বর্ধমান জেলার গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি লাল পতাকার মিছিল। যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে লাল পতাকাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন তারাও নতুন করে লাল পতাকা কাঁধে নিয়ে মিছিলের সামনের সারিতে সামিল হচ্ছেন।

হিরোশিমা-নাগাসাকি দিবস পালিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ আগস্ট : 'আর নয় হিরোশিমা-নাগাসাকি'— সুন্দর হোক এই পৃথিবী—এই অঙ্গীকারে ঋদ্ধ হয়ে আজ সন্ধ্যায় পালিত হল যুদ্ধ-বিরোধী দিবস। গানে, আবৃত্তিতে, বক্তব্যে অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল মনোরম। সেইসঙ্গে এই মঞ্চ থেকে ভারতপথিক রামমোহন রায়ের সম্পর্কে মুখবই-এ স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার কারণে পূর্ব বর্ধমান ও গুসকরার বিজ্ঞান কর্মী সৈকত-এর উপর আক্রমণের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। আজকের এই সভাটি পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান কেন্দ্র দুর্গাপুর এবং পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ দুর্গাপুর পূর্বাঞ্চল শাখায় যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল। বক্তব্য রাখেন সজল বসু, শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও রামপ্রণয় গাঙ্গুলী প্রমুখ। এছাড়াও আজ বিকালে মেমারি-১ বিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষ থেকে চকদিঘি মোড়ের পোস্টার প্রদর্শনী সহ প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন প্রতিবাদী কবিতা পাঠ করেন প্রধান শিক্ষক ইমতাজুল মণ্ডল, অমিত বিশ্বাস, তাপস পাল, বৈদ্যনাথ হাঁসদা প্রমুখ।

সুশান্ত কোনারের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ৯ আগস্ট : সিপিআই(এম)-এর মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটির জামনা শাখার সদস্য সুশান্ত কোনার (৭২)-র জীবনাবসান হয়েছে। বেশ কিছুদিন বার্ধক্যজনিত রোগে ভোগার পর ৯ আগস্ট সকাল আটটা নাগাদ নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শেষ শ্রদ্ধা জানান এরিয়া কমিটির সম্পাদক ওসমান গনি সরকার, ধনঞ্জয় সামন্ত, পরেশ সামন্ত, আসফার শেখ, তনয় কোনার প্রমুখ। এদিন নবদ্বীপ শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সমাধা হয়। তিনি কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৮৪ সালে তিনি সিপিআই(এম) সদস্যপদ অর্জন করেন। আমৃত্যু তিনি সেই পদেই আসীন ছিলেন। তিনি কাটসিহি উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মেহনতি মানুষের জন্য কাজ করেছেন। বাম আদর্শের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও সততা মানুষকে আকৃষ্ট করতো।

গণ্ডিবদ্ধ এলাকায় বর্জ্য সংগ্রহের গাফিলতিতে সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কা

কিশোর মাকর : লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গণ্ডিবদ্ধ এলাকা। সেই গণ্ডিবদ্ধ এলাকা থেকে বর্জ্য সংগ্রহে গাফিলতির অভিযোগ উঠছে পুরসভার বিরুদ্ধে। এখনো পর্যন্ত শহরে ১০০ ছাড়িয়ে গেছে গণ্ডিবদ্ধ এলাকা। করোনা আক্রান্তের বাড়ি অথবা গণ্ডিবদ্ধ এলাকাতে সাফাইকর্মীরা আসছেন না বর্জ্য নিতে। এমনি অভিযোগ করলেন শহরের এক দম্পতি। বার বার বলার পর জঞ্জাল নিয়ে যায়। কোনোরকম স্বাস্থ্যবিধি ছাড়াই সাফাইকর্মীরা বর্জ্য নিয়ে যাচ্ছেন। ফলে সংক্রমণ ছড়াবার আশঙ্কা করছেন অনেকেই।

স্বাস্থ্যদপ্তরের নির্দেশিকা বলছে বর্জ্য রাখার জন্য সংক্রমিতের বাড়িতে হলুদ রঙের ঢাকা দেওয়া পাত্র সরবরাহ করতে হবে পুরসভাকে। সাফাইকর্মীর দল পিপিই পরে ওই বাড়িরে বর্জ্য সংগ্রহ করবে। তারপর নির্দিষ্ট জায়গায় ছয় ফুট গর্ত করে পুঁতে দিতে হবে। স্বাস্থ্যকর্তাদের অভিমত এই নিয়ম মানলে সংক্রমণের ভয় থাকে না। পর্যাপ্ত কর্মীর অভাবে স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে না তা স্বীকার করে নেন কর্তৃপক্ষ। পুর কর্তৃপক্ষ ঠিক করেছে সংক্রমিত বাড়িতে কালো ও হলুদ রং-এর প্যাকেট দেওয়া হবে। ১৪ দিন পর ওই বাড়ি থেকে জীবাণুনাশক স্প্রে করে ব্যাগগুলি সংগ্রহ করা হবে। এই প্রক্রিয়া চালু করতে ১০ হাজার ব্যাগ কেনার বরাত দেওয়া হয়েছে। জেলায় মোট করোনা আক্রান্ত ১৩৬০, অ্যাক্টর রোগী ৩৬৮, ইতিমধ্যে সুস্থ ৯৬৩, মৃত ২৯, ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত-৭৬। বর্ধমান শহর-৪৭, বর্ধমান-২ ব্লক-৮, বর্ধমান ব্লক-১ ২, কালনা-২ ব্লক-৩, কালনা-১ ব্লক-১, রায়না-১ ব্লক-৩, রায়না-২ ব্লক-২, গলসি-২ ব্লক-২, কেতুগ্রাম-১ ব্লক-২, আউশগ্রাম-২ ব্লক-১, ভাতার ব্লক-১, খণ্ডঘোষ-১, মেমারি-১-১, মতেশ্বর ব্লক-১।

শুধুমাত্র ২৪ ঘন্টার হিসাব ৯ আগস্ট, ২০২০।

বিশ্ব আদিবাসী দিবস

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের** অনুপ্রেরণায়

বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদ্‌যাপন (৯–১০ আগস্ট ২০২০)

রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠান সূচি ৯ আগস্ট ২০২০ সময়: বেলা ২টো

সিধু–কানু হল, ঝাড়গ্রাম কালেক্টরেট, ঝাড়গ্রাম

গৌরবময় উপস্থিতি:

ড.পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মাননীয় মন্ত্রী, বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, পরিষদীয় বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবহণ, সেচ ও জলপথ, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডাঃ সুকুমার হাঁসদা, মাননীয় বিধায়ক, ঝাড়গ্রাম, উপাধ্যক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

শ্রী দুলাল মুর্মু, মাননীয় বিধায়ক, নয়াগ্রাম

শ্রী রবিন টুডু, মাননীয় চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ ও শিক্ষা পর্ষদ

শ্রী খগেন্দ্রনাথ হেমব্রম, মাননীয় বিধায়ক, বিনপুর

শ্রী চূড়ামণি মাহাতো, মাননীয় বিধায়ক, গোপিবল্লভপুর

শ্রীমতী মাধবী বিশ্বাস, মাননীয়া সভাধিপতি, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদ

শ্রীমতী বীরবাহা সোরেন, বিশিষ্ট সমাজকর্মী

এছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথি

চা বাগান ময়দান, কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার

গৌরবময় উপস্থিতি:

শ্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ, মাননীয় মন্ত্রী, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রী ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ

শ্রী দেবাশীষ গোস্বামী, সভাপতি, রাজ্য উপদেষ্টা কমিটি, ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন

শ্রীমতী শিলা দাস সরকার, মাননীয়া সভাধিপতি, আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ

শ্রী সৌরভ চক্রবর্তী, মাননীয় বিধায়ক, আলিপুরদুয়ার

শ্রী বুলু চিক বরাইক, মাননীয় বিধায়ক, মাল

শ্রী দশরথ তির্কে, মাননীয় প্রাক্তন সাংসদ

শ্রী মনোরঞ্জন দে, মাননীয় সহকারী সভাধিপতি, আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ

এছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথি

জেলাস্তরের অনুষ্ঠান সূচি

তারিখ: ৯ আগস্ট ২০২০
সময়: বেলা ২টো

আদিবাসী চর্চা কেন্দ্র, নাগরাকাটা, জলপাইগুড়ি
ইটাহার উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, ইটাহার, উত্তর দিনাজপুর
দেবী কোর্ট ভবন, গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর
মানবাজার–১ ব্লক, পুরুলিয়া

তারিখ: ১০ আগস্ট ২০২০ || সময়: বেলা ২টো

বিডিও অফিস ক্যাম্পাস, গাজল, মালদহ
শহিদ প্রদ্যুৎ স্মৃতি সদন, জেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, পশ্চিম মেদিনীপুর
ধনেখালি ব্লক, হুগলি
মহম্মদ বাজার, বীরভূম
আউসগ্রাম–১ব্লক, পূর্ব বর্ধমান
রাণীবাঁধ ব্লক, বাঁকুড়া
বীর সিধু–কানু নগর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, কল্যাণী, নদীয়া
কাঁকসা ব্লক, পশ্চিম বর্ধমান

করোনা সংক্রান্ত সমস্ত নির্দেশিকা মেনে বিশ্ব আদিবাসী দিবস – ২০২০ পালন করা হবে।

আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

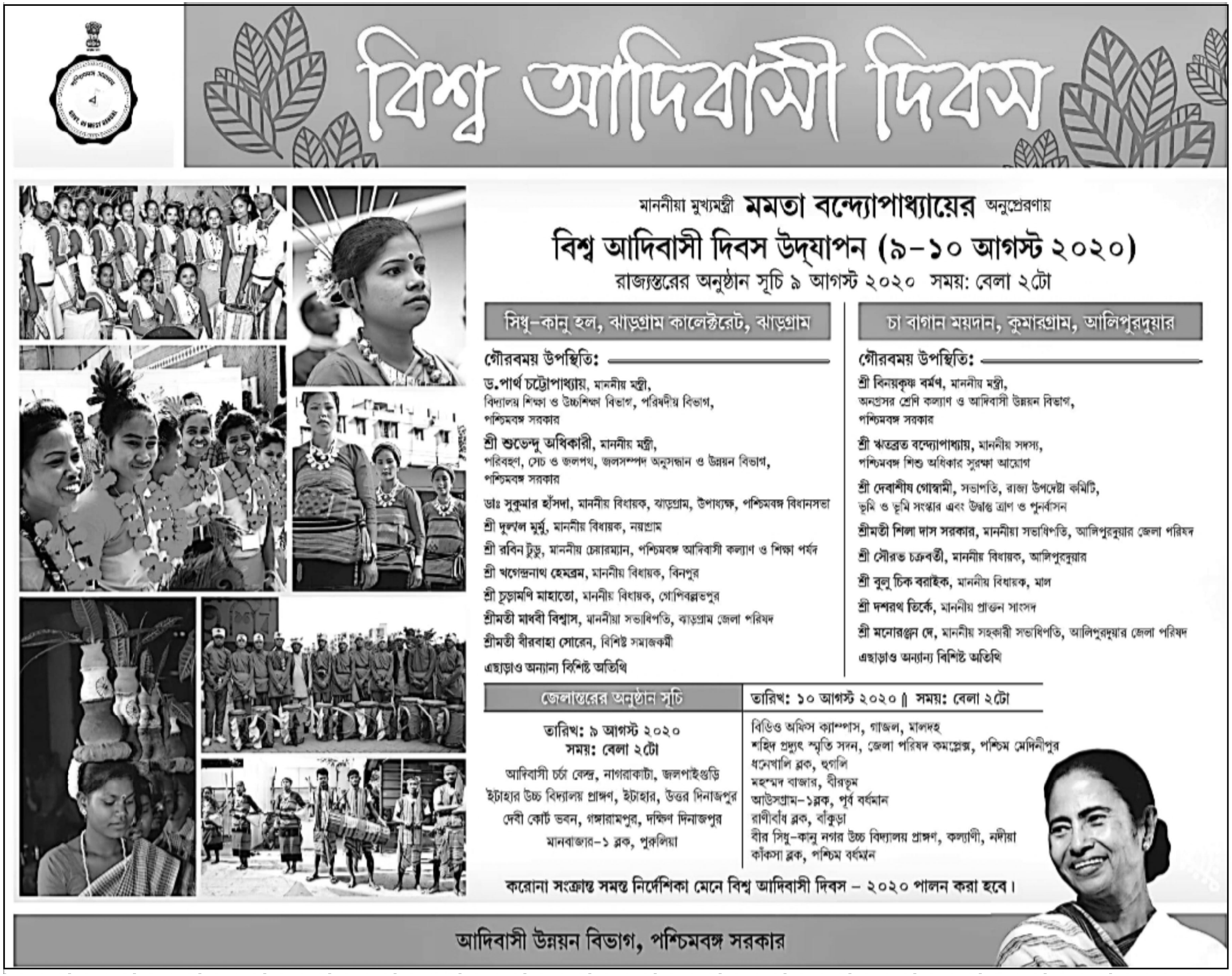

লড়াকু কৃষকনেতা নিখিলানন্দ সর-এর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

কাজী আবদুল করিম

প্রাক্তন বিধায়ক, বর্ধমান জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি, প্রাক্তন সাংসদ, লড়াকু কৃষক নেতা নিখিলানন্দ সর বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার মামার বাড়ি কৈচরে ৩০ জুলাই ১৯৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের আদিবাড়ি নিগন গ্রামে।

মামা অনঙ্গ রুদ্র বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। এই মামাই ছিলেন নিখিলানন্দ সরের আদর্শ। ছোটবেলা থেকে মামার বাড়ি কৈচর ছিল তাঁর আদর্শ জায়গা। কৈচর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি পড়াশুনা শুরু করেন। সেইসময় কৈচর প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল খুব নামকরা বিদ্যালয়। সেই সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ৪র্থ শ্রেণিতে বৃত্তি দেওয়ার জন্য পরীক্ষা নেওয়া হতো।

১৯৪৭ সাল : এ বছর বর্ধমান জেলায় স্কলারশিপ দেওয়ার জন্য পরীক্ষা নেওয়া হয়। সাত হাজার ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দিয়েছিল। নিখিলানন্দ সর সেই পরীক্ষায় প্রথম হন। কৈচরে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে আর এক নামকরা স্কুল মাথরুন স্কুলে ভর্তি হয়ে দু'বছর পড়াশুনা করে (ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত) কাটোয়া চলে যান, সেখানে মামা থাকতেন। মামা পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান হয়েছিলেন। মামা পার্টির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে কাজ করার জন্য প্রায়ই পুলিশ এসে মামাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেত। তাই বেশিদিন তাঁর কাটোয়ায় থাকা সম্ভব হয়নি। তাই দু'বছর কাটোয়ায় কাটিয়ে বলগোনার হাইস্কুলে ভর্তি হন।

১৯৫৪ সাল : বলগোনাতেই প্রথম সুবোধ চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় হয়। সুবোধ চৌধুরী তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক।

১৯৫৬ সাল : সুবোধ চৌধুরীই নিখিলানন্দ সরকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ দেন। তারপর থেকে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ শুরু হয়। এই সময় বর্ধমান রাজ কলেজে বি.এ ক্লাসে ভর্তি হন এবং গ্র্যাজুয়েট হন। ইচ্ছে ছিল আইন নিয়ে পড়াশুনার। রাজনীতি এবং ওকালতি এটাই ছিল লক্ষ্য। কলকাতায় গিয়ে ভর্তিও হন।

১৯৬১ সাল : চীন-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে চীনের দালাল বলে চিহ্নিত করে কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীদের ধরপাকড় শুরু হয়। নিখিল সরও গ্রেপ্তার হন। ফলে ল'-এর ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারেননি। পরে ইচ্ছে ছিল লেবার ল নিয়ে পড়াশুনা করার, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে আর হয়ে ওঠেনি। জীবনে বহুবার গ্রেপ্তার হয়েছেন। সেই সময় বামপন্থী নেতাদের জীবনের এটাই অঙ্গ ছিল। মঙ্গলকোটের যবগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষিক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হওয়ার জন্য সেই শিক্ষকতাও ত্যাগ করেন।

১৯৬৯ সাল : কৃষক সংগঠনের কাজে বাড়ি বাড়ি যেতেন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পায়ে হেঁটে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলেন। মঙ্গলকোটের এমন কোনো গ্রাম ছিল না যেখানে তিনি যাননি। তাঁর সাহস, লড়াকু মেজাজ এবং জমি উদ্ধারের আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা রূপকথার গল্পের মতো মঙ্গলকোট- কাটোয়ার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে। প্রায় প্রতিদিন সংগঠনের কাজ শেষ করে গভীর রাত্রে তিনি ফিরতেন। মোটর সাইকেল কিনেছিলেন অনেক পরে সংগঠনের কাজের সুবিধার জন্য। ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়েই জমির আন্দোলন গতি পায়। তারপর ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ে খাস, জমি, বেনামি জমি উদ্ধারের জন্য কৃষকসভা সিদ্ধান্ত নিলে তিনি তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৬৯ সালে তিনি মঙ্গলকোট বিধানসভা থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন।

১৯৬৯ সালের ২২ জুন (২২ আষাঢ়) কৃষকসভার সিদ্ধান্ত মতো চৈতন্যপুরের জমিদার রায়চৌধুরীদের হাজার হাজার বিঘা জমির মধ্যে মাত্র সাড়ে নয় বিঘা খাস জমি দখলের জন্য কৃষকসভার নেতৃত্বে মানুষ সমবেত হন। নেতৃত্ব দেন নিখিলানন্দ সর। কৃষকনেতা সমর বাওরাও উপস্থিত ছিলেন। চৈতন্যপুরের জমিদারকে সাহায্য করার জন্য আশেপাশের জমিদাররা তাদের বন্দুক সহ লেঠেল সরবরাহ করে। নিখিলানন্দ সর এবং সমর বাওরার নেতৃত্বে মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় জমিদারের লেঠেল বাহিনীর ২২টি বন্দুক গর্জে ওঠে। নিখিলানন্দ সরকে লক্ষ করে একটি গুলি ছুটে আসে। নিখিলানন্দ সরের সামনে থাকা ২৭ বছরের যুবক বলরাম

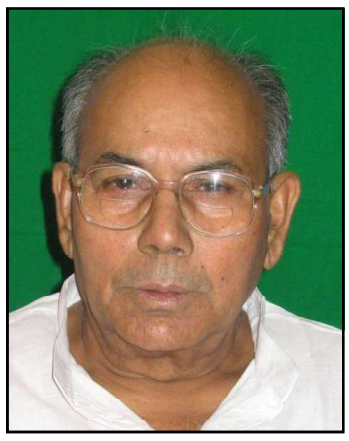

কুশমেটের বুক ভেদ করে চলে যায় সেই গুলি। সেই রক্তাক্ত দেহকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে আবার যখন মিছিল শুরু হয় তখন ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে মিছিলে লাগে, সমর বাওরার বাম হাতে লাগে গুলি। তিনি অজ্ঞান হয়ে যান, তাঁকেও হাসপাতাল পাঠানো হয়। কিন্তু নিখিলানন্দ সরকে তবুও রোখা যায়নি। তিনি নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে যান। টাঙ্গি দিয়ে হত্যা করা হয় আর এক কৃষককর্মী পাঁচকড়ি মাঝিকে। তবুও নেতৃত্বকে দমানো যায়নি। ১০৪ জন কর্মী আহত হন। কিন্তু তবু জমি দখল সম্পন্ন হয়। এই লড়াকু মেজাজ দেখে জমিদার রণে ভঙ্গ দিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যান। এই লড়াইয়ের কাহিনি বর্ধমান জেলা সহ পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে যায়।

২৭ জুন কৃষকসভা এই হত্যার প্রতিবাদে সমাবেশের ডাক দেয়। তাতে বক্তব্য রাখেন কৃষকনেতা তথা মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার, পার্টির জেলা সম্পাদক সুবোধ চৌধুরী, শিবশংকর চৌধুরী এবং নিখিলানন্দ সর। শহিদদের উদ্দেশ্যে শোকজ্ঞাপন ও শপথ গ্রহণ করেন।

১৯৭১-৭৭ সাল : ১৯৭১ সালেও নিখিলানন্দ সহ মঙ্গলকোট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হন। সিপিআই(এম) দল বেশি সংখ্যক আসন পেলেও মন্ত্রিসভা গড়তে দেওয়া হয় না। তারপর ১৯৭২ সালে নির্বাচনের নামে প্রহসন। নিখিলানন্দ সরও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গার মতো পরাজিত হন। নেমে আসে আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস। সেই ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের কারণে পার্টির নির্দেশে তাঁকেও আত্মগোপন করতে হয়। তিনি আত্মগোপন করে এলাকায় এলাকায় গোপনে গ্রুপ মিটিং করতে থাকেন।

এই সময় পুলিশ অফিসার সুলতান সিংকে নকশাল আন্দোলন দমনের জন্য বর্ধমান জেলা ও বীরভূম জেলার দায়িত্ব দিয়ে প্রশাসন পাঠায়। সেদিন সন্ধ্যার পর মঙ্গলকোটের একটি গ্রামে নিখিলানন্দ সর পার্টিকর্মীদের নিয়ে গোপন মিটিং করছেন। খবর পেয়ে পুলিশ অফিসার সুলতান সিং খুব সন্তর্পণে নিখিল সরকে ধরার জন্য একাই জিপ চালিয়ে সেই এলাকায় চলে আসেন। কিন্তু রাস্তা খারাপ থাকায় জিপ উল্টে তিনি পড়ে অজ্ঞান হয়ে যান। খবর পেয়ে নিখিলানন্দ সর এবং সমর বাওরা সেখানে গিয়ে হাজির হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় সুলতান সিংকে তুলে নিয়ে গিয়ে স্থানীয় এক হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। তারপর কিছুটা সুস্থ দেখে চলে যান। পরে সুস্থ হয়ে সুলতান সিং জানতে পারেন তিনি যাকে ধরতে গিয়েছিলেন তিনিই তাঁকে বাঁচিয়েছেন। তখন অবাক হয়ে যান। যখন আহত হয়ে অজ্ঞান হয়েছিলেন তখন কপালটি গভীরভাবে কেটে গিয়েছিল, সেই কাটা দাগ দেখিয়ে পরবর্তী সময়ে (বামফ্রন্ট সরকার গঠন হওয়ার পর) তিনি নিখিলানন্দ সর-এর সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন—"এই দাগ আমার আর মেলাবে না, আমি আপনাকেই গ্রেপ্তার করার জন্য সেদিন যাচ্ছিলাম, আর আপনিই আমাকে বাঁচালেন—একথা আমি কোনোদিনই ভুলতে পারবো না।"

৭০-এর দশকে এই সময় আর এলাকায় থাকা নিরাপদ নয় বলে পার্টির নির্দেশে আত্মগোপন করে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রথমে যান বিহারে তারপর উত্তরপ্রদেশে, নেপালের বর্ডার, তারপর একে একে চণ্ডীগড়, কাশ্মীরের কুঁদ এলাকা, রাজস্থান। এখানে নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পেটের খিদে মেটাতেন। তারপর গুজরাটে যান এবং এখানে স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের এতো আপন হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি ভেবেছিলেন এখানেই বাকি জীবনটা শিক্ষকতা করে কাটিয়ে দেবেন।

১৯৭৭-১৯৯২ সাল : পার্টির নেতা হরমোহন সিং ডাক দিলেন এলাকায় ফিরে এসো। তাই আবার মঙ্গলকোটে প্রত্যাবর্তন এবং বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হলেন। এবং টানা তিনবার মঙ্গলকোটের বিধায়ক।

১৯৯৩-৯৫ সাল : তাঁকে 'তন্তুশ্রী'-র চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। তিনি এই সময় তাঁতশিল্পে গতি আনতে পেরেছিলেন। জেলায় জেলায় তন্তুশ্রী শো-রুম তৈরি করেছিলেন।

১৯৯৫-১৯৯৮ সাল : পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদ সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী এবং জয়ী হয়ে ১৯৯৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচিত হলেন। দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে ১৯৯৮ সালের ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত এই পদে ছিলেন।

১৯৯৮ সাল : লোকসভা উপনির্বাচনে বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ হন।

১৯৯৯-২০০৯ সাল : তিনি পরপর দু'বার লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়ান এবং জয়ী হন। এবং দক্ষতার সঙ্গে সাংসদের দায়িত্ব পালন করেন।

আজকের বর্ধমান রেল স্টেশন সংলগ্ন যে ওভারব্রিজ তৈরি হয়েছে তা তাঁর সময়েই অনুমোদিত হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন জটিলতায় তৈরি হয়নি। যেমন আজও তৈরি হয়নি তাঁর সময় অনুমোদিত কালনা গেট ওভারব্রিজ, শক্তিগড়, রসুলপুর এবং মেমারি রেললাইনের ওপর ওভারব্রিজ। এইসব জায়গায় ওভারব্রিজ করার জন্য তিনি নির্দিষ্টভাবে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন।

২০০৯-২০২০ সাল : দীর্ঘদিন শারীরিক অসুস্থতার জন্য সেভাবে আর সাংগঠনিক কাজ করতে পারতেন না। বর্ধমান শহর সংলগ্ন বিজয়রামের নিজ বাড়িতে থাকতেন। এখানে থেকেই নিয়মিত পার্টির সব খোঁজখবর রাখতেন। সুদূর কাটোয়া-মঙ্গলকোট থেকে শুরু

—এরপর চারের পাতায়

প্রেষণাই ছিল তাঁর প্রাণশক্তি

শ্যামসুন্দর বেরা

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে ব্যক্তির নিজস্ব বা সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মিবর্গের কর্মস্পৃহার ওপর। কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা (ইংরেজিতে 'মোটিভেশন') হল স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কাজ করার ইচ্ছা অথবা কাজে মনোনিবেশ না করা বা কাজ থেকে মন সরিয়ে নেওয়া। বাস্তবে কর্তব্যনিষ্ঠ এবং অনন্যোপায় হয়ে কিংবা একরকম বাধ্য হয়ে কাজের ভান করে লেগে আছেন—দুরকম মানুষই চোখে পড়ে। কর্মস্পৃহা বিষয়টি মানুষের মনের একেবারে ভেতরকার বিষয়। কাজের প্রতি ইতিবাচক বা নেতিবাচক মানসিকতা নির্ভর করে মানুষের বেড়ে ওঠার পরিবেশ, পারিবারিক শিক্ষা এবং মানবিক চেতনার ওপর। জোর করে বা আইন করে প্রেষণা বা কর্মস্পৃহা তৈরি করা যায় না।

লেখার শুরুতে জনপ্রশাসন বিষয়ক একটি প্রাথমিক তত্ত্বের উত্থাপন না করলে আমার অনুভবে কেমন ছিলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় তা বলা যাবে না। প্রথম দর্শনে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা হয়তো করা যায় কিন্তু অনুভবের জায়গা তৈরি হতে দীর্ঘ সময় লাগে, লাগে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ। পরিচিতির কেন, বলা যায় পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার বৃত্তে তাঁর সান্নিধ্যে থেকেছি পঁচিশ বছর। প্রবন্ধ বা নিবন্ধে 'আমি' বা 'আমার' শব্দগুলির প্রয়োগ অনুচিত। এই লেখা সম্পূর্ণ রূপে স্মৃতিচারণ। স্বাভাবিক কারণে শব্দগুলি এসেছে।

প্রথম আমার বর্ধমানে আসা ১৯৯৫ সালে। উদ্দেশ্য 'নতুন চিঠি' পত্রিকার মুদ্রণ পদ্ধতির আধুনিকীকরণের অঙ্গ হিসেবে কম্পিউটারে বাংলা সফ্‌টওয়্যার লোড করা। একই সঙ্গে সাপ্তাহিক ট্যাবলয়েড পত্রিকার টেমপ্লেট তৈরি করা এবং কীভাবে কম্পোজ করা হয় সেটি দেখানো। তারপর অফসেট মুদ্রণের জন্য ট্রেসিং-এ কীভাবে প্রিন্ট নিতে হবে তা দেখানো। অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি থেকে অফসেটে ছাপার ট্রেসিং করা পর্যন্ত পর্বগুলি দেখানো। কলকাতার দৈনিক খবরের কাগজে সংশ্লিষ্ট কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা এবং সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ অভীক গোস্বামীর সঙ্গে পূর্ব পরিচিতির সূত্রে বর্ধমানে আসা।

নতুন চিঠি-র ৬২ বি সি রোডের ঠিকানায় তখনও কম্পিউটার আসেনি। কম্পিউটার ছিল সিপিআই(এম) জেলা দপ্তর প্রভাত কুণ্ডু ভবনে। সেদিন সফ্‌টওয়্যার লোড করা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যে দু-জন প্রাজ্ঞ মানুষ উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। খানিক খানিক ছিলেন দিনেশ ঝা, পার্থ চৌধুরী। এক বেলায় একটা মানুষ কীভাবে চার পাতার একটা ট্যাবলয়েড কম্পোজ করবে তা দেখতে উপস্থিত ছিলেন তখনো লেটার প্রেসে চলা সাধনা প্রেসের কম্পোজিটররাও।

লেটারপ্রেস, লাইনোটাইপ, মনোটাইপ, পিটিএস (ফটোটাইপ সেটিং)-এর পরে খবরের কাগজে আধুনিক মুদ্রণ পদ্ধতি হিসেবে আসে ডিটিপি এবং অফসেট। কলকাতায় সংবাদপত্র দপ্তর, ছাপাখানা ইত্যাদিতে ব্যাপক ভাবে ডিটিপি-অফসেট চালু হলেও সে-সময় এই প্রযুক্তিতে ছাপার কাজ বর্ধমানে চালু হয়নি। কিছু পত্রপত্রিকা বাইরে কম্পোজ করে অফসেট করে আনত। সাপ্তাহিক কাগজ হিসেবে আধুনিক মুদ্রণ পদ্ধতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার কৃতিত্ব সম্ভবত 'নতুন চিঠি'-রই। বলা যায়, খবরের কাগজে ডিটিপি ব্যবহারে আমরা ছিলাম প্রথম প্রজন্মের। এই নিয়ে আমাদের একটা শ্লাঘা ছিল যে আমরা একই সঙ্গে কম্পিউটার এবং আধুনিক মুদ্রণের খুঁটিনাটি জানি।

বর্ধমানে আসার দিন প্রথম পর্বে ছিল বাংলা সফ্‌টওয়্যার লোড করার বিষয়টি। সেই কাজ করতে গিয়ে আত্মশ্লাঘা ধাক্কা খেয়েছিল যাট ছুঁইছুঁই অশোকবাবুকে দেখে। এই বয়সী একজন মানুষ বর্ধমানের সাপ্তাহিক পত্রিকা অফিসে ১৯৯৫ সালে কম্পিউটার বিষয়ে এত এগিয়ে, এত আধুনিক! মনোটাইপের বাংলা সফটওয়্যারের জন্য কম্পিউটারের কী কনফিগারেশন লাগে, উইনডোজ-এর কত ভার্সন লাগে, হার্ড ডিস্কে কত জায়গা নেবে, কমপক্ষে কত মেমোরি থাকতে হয় ইত্যাদি অশোকবাবুর নানান প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ওনাকে দেখা এবং ওনার সম্পর্কে অবাক হওয়ার সেই শুরু। জ্যোতির্ময়বাবু অবশ্য কম্পিউটারের কারিগরি বিষয়ে তত কিছু জানতে চাননি। তিনি টাইপোগ্রাফি, গ্রাফিক্স, লেখচিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। পেজমেকার, কোরেল ড্র, ফটোসপ ইত্যাদির ব্যবহারে টেক্সট এবং গ্রাফিক্স-এর মিশেলে পত্রিকার যে রূপ বদল হবে

এবং মনের মতো করে উপস্থাপন করা যাবে সে বিষয়টিতে নিশ্চিত হয়েছিলেন দুজনেই।

'সংবাদ প্রতিদিন'-এর পরে সে-সময় আমার কর্মস্থল ছিল যুগান্তর-অমৃতবাজার পত্রিকা। চরম ডামাডোলের সময়। মালিক পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছে, শ্রমিক সংগঠন চালু রাখার চেষ্টা করছে। বেতন দেবে কে তার নিশ্চয়তা নেই। যুগান্তর-এর এমন অবস্থা জেনেই বোধহয় 'নতুন চিঠি'র পরিচালকরা ডিটিপি করার ব্যাপারে আমার কথা ভেবেছিলেন। খোঁজ নিয়ে একদিন 'যুগান্তর'-এর নোনাপুকুর ট্রামডিপোর অফিসে হাজির হয়েছিলেন দিনেশ ঝা। সেখানেই তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা জানান। শুরু হয় আমার বর্ধমান-যোগ। প্রতি শনিবার সকালে এসে সাপ্তাহিকের কাজ সেরে সন্ধ্যায় ফিরে যেতাম শেওড়াফুলি। সাপ্তাহিক সংখ্যা, নানা বিশেষ সংখ্যা, প্রায় সাড়ে চারশো পাতার শারদ সংখ্যা—নতুন চিঠি-র তখন অনেক কাজ। সুচারু সেইসব প্রকাশনার কাজে আস্থাভাজন হয়েছিলাম কর্তৃপক্ষের। কর্তৃপক্ষ বলতে জ্যোতির্ময়বাবু সম্পাদক আর অশোকবাবু ছিলেন 'নতুন চিঠি'র প্রকাশক। স্বত্বাধিকারী হিসেবে তাঁর নাম থাকলেও তথাকথিত 'মালিক' ছিলেন না। আসলে 'নতুন চিঠি' শুধু একটি পত্রিকা নয়, সিপিআই(এম) বর্ধমান জেলার একটি শাখা সংগঠন। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নতুন চিঠি পত্রিকার প্রাণপুরুষ, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। আমার প্রথম দেখার সময় অশোকবাবু ছিলেন একজন ব্যস্ততম মানুষ। ছিলেন রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, পশ্চিমবঙ্গ অর্থ নিগম, পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের সভাপতি। এছাড়াও যুক্ত ছিলেন নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। থাকতেন কলকাতায়। প্রতি সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে দেখা হত না। মাঝেমাঝে দেখা হত শনিবারে।

যুগান্তর-অমৃতবাজার পত্রিকার

—এরপর চারের পাতায়

প্রেষণাই ছিল তাঁর প্রাণশক্তি

—তিনের পাতার পর

ডামাডোল দেখে, প্রাইভেট সংস্থায় কাজের ধরন, বেতন, নিরাপত্তাহীনতা অনুধাবন করে নিজে কিছু করা দরকার—এই ভাবনায় মনোনিবেশ করি। বাড়িতে ডিটিপি শেখাবো চিন্তা করে একটি কম্পিউটার কিনি এবং কাজ শুরু করি। শেখানোর পাশাপাশি ধীরে ধীরে ডিটিপি-র কাজ আসতে শুরু করে এবং সেটিই একসময় জীবিকায় পরিণত হয়। ধীরে ধীরে কম্পিউটারের সংখ্যা বাড়ে, স্টেশনের পাশে একটি ঘর নিয়ে ‘লেজারপ্লাস’ নামে একটি ডিটিপি এবং অফসেট প্রিন্টিংয়ের প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। শনিবার নতুন চিঠি-র কাজ এবং সঙ্গে ‘লেজারপ্লাস’-এর কাজ। কাজের দক্ষতা এবং আত্মনির্ভরতার মানসিকতা মুগ্ধ করেছিল অশোকবাবুকে। তাঁর ভাষায় এটি ছিল ‘এনট্রেপ্রেনরশিপ’-এর লক্ষণ। এক শনিবার কাজের ধারা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জেনে প্রতিষ্ঠানকে আরও বড়ো করার জন্য উদ্যমী হওয়ার কথা বলেন। জেরক্স অফসেট, আরো বড়ো ডিটিপি ইউনিট গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে ‘পশ্চিমবঙ্গ অর্থ নিগম’-এর কলকাতা অফিসে দেখা করতে বলেন। গিয়েছিলাম। এগিয়েও ছিল বিষয়টি। শেষমেষ বাস্তবায়িত হয়নি গড়পড়তা বাঙালি মানসিকতায়। যাই হোক, তিনি কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন আমাকে ‘এনট্রেপ্রেনর’ করতে। হওয়া হয়নি, এটা বাস্তব।

ইতিমধ্যে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে জেনেছি। জেনেছি তাঁর অনাড়ম্বর জীবনচর্যা, ভারত সেরা সমবায়ী হিসেবে তাঁর কর্মকাণ্ডের কথা। বাংলাদেশে গিয়ে দেখে এসেছেন মুহম্মদ ইউনুসের ‘মাইক্রো ফিনান্স’-এর কাজ। সেই ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে গরিব মানুষকে, বিশেষ করে, মহিলাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে তাঁদের উৎসাহ যুগিয়েছেন, তাঁদের ঋণদান করে কীভাবে স্বনির্ভর করা যায় সে-বিষয়ে অনেক কাজ করেছেন।

শারীরিকভাবে অসুস্থ অশোকবাবুর কর্মস্পৃহা ছিল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। স্বনির্ভর হয়ে কাজ করতে চাওয়া একজন মানুষের কাছে তিনি ছিলেন প্রেরণা স্বরূপ। একটি ঘটনা মনে পড়ছে। ১৯৯৭-৯৮ সাল নাগাদ বর্ধমান জেলা ছাত্র-যুব উৎসব হয় কালনায়। সরকারি বড়ো এই উৎসবের সমস্ত ছাপার কাজ হয়েছিল ‘নতুন চিঠি’ দপ্তরে। অতি অল্প সময়ে কাজ সারতে সারা রাত কাজ হয়েছিল। মনে আছে সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত যুব কর্মীরা কেউ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সময়বুঝে, কেউ বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। খবরের কাগজের কর্মী হিসেবে আমার সারা রাত কাজ করার অভ্যাস ছিল। অবাক হয়ে দেখেছিলাম ষাট পেরোনো অসুস্থ মানুষটির কর্মদক্ষতা, স্পৃহা, সারা রাত জেগে কাজ করা, কাজ করিয়ে নেবার মানসিকতা। সময় পেরিয়েছে কলকাতার কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। সমাজ উন্নয়নমূলক নানান কাজে যুক্ত হয়েছেন তার পরও। তৈরি করেছেন কৃষি এবং পরিবেশ উন্নয়নমূলক সংস্থা।

২০১৫ থেকে তাঁর সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল তাঁর ‘সমবায় ও মানবসভ্যতা’ শীর্ষক গ্রন্থের নির্মাণ সহযোগী হিসেবে। তিনি ছিলেন আমাদের রাজ্য তথা দেশের সমবায় আন্দোলনের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। সমবায় আন্দোলনের অতীতের নানা দুর্বলতা কাটিয়ে এই আন্দোলনকে আধুনিক তথা বাস্তব ধারণার ভিতের ওপর শুধু প্রতিষ্ঠা করেননি, সমাজের নানা স্তরে তা ছড়িয়ে দেবার কাজটি সার্থকভাবে করেছিলেন। ৫১০ পাতার তথ্যনিষ্ঠ গ্রন্থটি ছিল তাঁর ‘সমবায়’ ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে বিচরণ তথা তন্নিষ্ঠ অভিজ্ঞতার ফসল। দীর্ঘ সময় ধরে সমস্ত পাণ্ডুলিপি তাঁর ল্যাপটপে কম্পোজ করে পরিকল্পনামাফিক সাজিয়ে রেখেছিলেন। ৭৮ বছর বয়সী একজন মানুষের কাজের প্রতি নিষ্ঠা, কম্পিউটারে তাঁর অনায়াস বিচরণ মুগ্ধ করেছিল। প্রায়শই বাড়িতে আসতেন লাঠি হাতে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে। প্রুফ বা অন্যান্য কাগজপত্র বেশি থাকলে আসতেন বাঁধা রিক্সা করে। খোঁজ নিয়ে যেতেন কম্পোজিং, সেটিং বিষয়ে। বুঝিয়ে যেতেন নানা বিষয়। গল্পে মাততেন মাঝে মাঝেই। একমাত্র কন্যাকে হারিয়েও নিজে ভেঙে পড়েননি বা স্ত্রীকে ভেঙে পড়তে দেননি বাস্তবধর্মী পারস্পরিক বোঝাপড়ায়। সে-কথাও বলতেন। খেতেন চিনি ছাড়া লাল চা। বিস্কুট ফেরত দিয়ে, চেয়ে নিতেন ছোট্ট বাটিতে আক্ষরিক অর্থেই একমুঠো মুড়ি।

বর্ধমানে প্রথম দিন এসে কারিগরি বিষয়ে তাঁর নানান প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে আমার মুগ্ধতার কথা দীর্ঘ বছর পর জানাতে হাসতে হাসতে বলেন তাঁর কম্পিউটার প্রীতির কথা। শুনে অবাক হই যে, কম্পিউটার বা অটোমেশনের বিরোধিতায় যখন বামপন্থীরা মুখর, সে-সময় তিনি কিন্তু বুঝেছিলেন কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তা। তিনি তাঁর অফিসে কম্পিউটার ব্যবহার শুরু করে দেন সম-সময়েই। ভীষণ আধুনিক মনস্ক ছিলেন তিনি। কোলকাতায় মোবাইল পরিষেবা চালু হবার সঙ্গে সঙ্গেই যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন এই নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থায়।

‘সমবায় ও মানবসভ্যতা’ শীর্ষক তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ২০১৬ সালের কলকাতা বইমেলায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের দুজনকেই। ৩০ জানুয়ারি ২০১৬ বাড়িতে এসে ভালোবাসার স্মারক হিসেবে স্বাক্ষর করে সেই বই দিয়ে গিয়েছিলেন। বার বার শুনিয়েছিলেন, এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করার কথা। সেই বইও সেটিং করে দেবার আগাম দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিলেন। দীর্ঘ অসুস্থতা মাঝে মাঝেই কাবু করে দিত তাঁকে। শেষ পর্যন্ত অসমাপ্তই থেকে গেছে ‘সমবায় ও মানবসভ্যতা’ গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ।

সমবায় আন্দোলনের কর্মী হিসেবে দীর্ঘ কাজের অভিজ্ঞতা তাঁকে অগ্রপথিক করেছিল সংশ্লিষ্ট কাজে। সমবায়ের সঙ্গে মানব ও মানব-সভ্যতার সম্পর্কের বিষয়টি আন্তরিকভাবে প্রভাবিত করেছিল তাঁর মননকে। গ্রন্থনামে ছিল তারই প্রতিফলন। মানবোন্নয়নমূলক সংগঠনকে সপ্রাণ রাখতে নানাভাবে সাহায্যের হাত প্রসারিত করতেন তিনি। নানাভাবে সাহায্য করেছেন অনেক ব্যক্তিমানুষকেও। ভারতের শ্রেষ্ঠ সমবায়ী ‘সমবায় রত্ন’ হিসেবে প্রাপ্ত সাম্মানিক অর্থও যেমন সমবায় সংগঠনকে দান করেছেন তেমনই প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা থেকে শুরু করে, জমি বিক্রির টাকাও দান করেছেন বিভিন্ন সংগঠনকে। অশোকবাবু প্রয়াত হয়েছেন ২৯ মার্চ ২০২০। তার মাত্র কয়েকদিন আগেও শহিদ শিবশংকর সেবা সমিতি এবং একটি সংগঠনকে সচল রাখতে অর্থ প্রদান করেছেন। মরণোত্তর দেহও তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের স্বার্থে দান করার অঙ্গীকার করে গিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেছেন সেই দেহ দান করতে এ দৃশ্য বিরল। অশোকবাবুর মার্চ মাসের শেষ পেনসনের অর্থও তাঁর স্ত্রী দান করেছেন করোনা-দুর্গত মানুষদের সাহায্যার্থে। বিরল মানুষ তাঁরা দু-জনেই। অশোকবাবুর মতো মানুষদের মনে রাখতে হয়, ভবিষ্যৎ মনে রাখে।

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০

—দুয়ের পাতার পর

হবে। আর্থিকক্ষেত্রে পিছিয়েপড়া বাড়ির ছেলেমেয়েরা ছিটকে যাবে। প্রাথমিকে প্রাতরাশ ভালো প্রস্তাব। কিন্তু আগে মিড-ডে-মিল ব্যবস্থায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং তাকে শক্তিশালী করতে হবে। সেটা কে করবে? বিদ্যালয়গুচ্ছ গঠন কোঠারী কমিশন গাইডলাইন অনুযায়ী করতে হবে।

কম শিক্ষার্থীর অজুহাতে পশ্চাৎপদ এলাকায় বিদ্যালয় তুলে দেওয়া চলবে না। এতে বিরূপ প্রভাব পড়বে। বিদ্যালয়ছুট বাড়বে, শিশুশ্রম বাড়বে। বেসরকারি স্কুলগুলির বেশিরভাগই মুনাফার উদ্দেশ্যে গঠিত। তাহলে এদের ক্ষেত্রে শিক্ষার অধিকার আইনের বিধি নিষেধ শিথিল করা হবে কেন? এরা কেন ইচ্ছেমতো ‘ফি’ নেবে? শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মীয় ট্রাস্টগুলিকে এত গুরুত্ব কেন দেওয়া হয়েছে? এতে শিক্ষার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ক্ষুণ্ণ হবে। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা বলা হলেও তাকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। উপরন্তু ষষ্ঠশ্রেণিতে ত্রিভাষা সূত্র চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি হবে। অপরদিকে ষষ্ঠ শ্রেণি হতে ইংরাজি চালু করতে চাওয়ায় বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। সরকার বা সরকার-পোষিত বিদ্যালয়গুলি গুরুত্ব হারাবে। প্রাচীন ভারতীয় ভাষাশিক্ষা নামে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার উপর এত গুরুত্ব কেন দেওয়া হবে? বিদ্যালয়স্তরের শিক্ষার্থীরা এতগুলি ভাষা শিক্ষার উপর কতদিন সময় ব্যায় করবে? ভোকেশনাল কেন চাপানো হবে? বিদ্যালয় স্তরে এবং উচ্চশিক্ষা স্তরে অনলাইন লার্নিং-এর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় সেই পরিকাঠামো নেই। অসংখ্য গরিব বাড়ির পড়ুয়াদের স্মার্ট ফোন নেই। নেট সংযোগ নেই। ফলে এরা বঞ্চিত হবে। শিক্ষায় বৈষম্য বাড়বে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা পাল্টে প্রস্তাব করা হয়েছে একে যুগোপযোগী করার নামে প্রাচীন ভারতের আর্য-বৈদিকযুগের দর্শন, গণিত, যোগ শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। অথচ আধুনিক বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়ে কার্যত কোনো ব্যবস্থা নেই। এতে একুশ শতকের উপযোগী কোনো নলেজসোসাইটি বা জ্ঞানমুখী সমাজ তৈরি হবে? উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বি.এড. যুক্ত করে চার বছরের ইন্টিগ্রেডেড স্নাতক স্তর করার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করতে চেয়ে আসলে বিশ্ববিদ্যালয় কাঠামোকেই ভেঙে ফেলতে চাওয়া হয়েছে। স্বশাসিত কলেজের নামে ৩০০০-এর বেশি শিক্ষার্থী নিয়ে বড় কলেজ গড়ার এবং তাদেরকে ডিগ্রি প্রদানের অধিকার দেওয়ার ফলে শিক্ষা ব্যবসায়ীরা শিক্ষা-ডিগ্রি বিতরণের দোকান খুলবে। আর সরকার শিক্ষা হতে নিজের দায় গুটিয়ে নিতে চাইবে। ১০০ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্যাম্পাস খুলতে অনুমতি দেওয়ার নামে উচ্চশিক্ষার দরজা বিদেশি কর্পোরেটদের কাছে খুলে দিতে চাওয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষা মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচের কথা বলে বলা হয়েছে এগুলি হবে বহুমুখী বিদ্যার চর্চার কেন্দ্র। নালন্দা, তক্ষশিলার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আসলে লিবারেল স্ট্যাডিজ পাঠক্রমকে মূলমন্ত্র করা হচ্ছে। শিক্ষানীতিতে তাই মার্কিনি ‘আইডিলীগ’ প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুকরণ করার কথা স্পষ্ট বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে তো ক্রেডিট বেসড চয়েস সিস্টেম আছে। তাকেই তো উপযুক্ত পরিকাঠামো ও শিক্ষকমণ্ডলী দিয়ে শক্তিশালী করা হোক। মূল্যবোধের শিক্ষার (Value Education) নাম করে ভারতীয় সংস্কৃতি ও প্রাচীন বিদ্যা পুনঃপ্রতিষ্ঠার নামে সঙ্ঘপরিবারের ভাবনাকে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্ঘ দলিলকে কার্যকরী করতে চাওয়া হয়েছে। এতে শিক্ষার সাম্প্রদায়িকরণ বাড়বে। শিক্ষানীতেতে সাম্য ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। অথচ শিক্ষাখাতে ব্যয় মোদি জামানায় প্রতিবছর কমছে। ১৯৬৮ সালের পর হতে আজ পর্যন্ত জি.ডি.পি-র ৬ শতাংশ কখনও ব্যয় হয়নি। আর্থিক দায় কে নেবে? তাই, শিক্ষা-বিরোধী এই শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে আমাদের সোচ্চার হতে হবে।

৯ আগস্ট ২০২০
স্বাস্থ্য বুলেটিন এক ঝলকে
কোভিড-১৯ আপডেট

আজ সর্বমোট স্যাম্পল পরীক্ষা	২৬,২৪২
নতুন সংক্রমণ	২,৯৩৯
আজ কোভিড মুক্ত	১,৯৯৬
রাজ্যে মৃত্যুর হার	২.১৫%
সর্বমোট কোভিড মুক্ত	৬৭,১২০
আজকের দিনে রাজ্যে মোট কোভিড-১৯ পজিটিভ	
হোম আইসোলেশনে	১৮,৮৫৭
সেফ হোমে	১,৫৫৮
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন	৫,৯৬০

যে কোনও অনুসন্ধানের জন্য ফোন করুন ১৮০০ ৩১৩ ৪৪৪ ২২২ নম্বরে
এবং কোভিড চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে
১টাই নম্বরের ৩২টি লাইনে ২৪x৭ থাকবেন ৯৬ জন ডাক্তার।
ফোন করুন ০৩৩ ২৩৫৭ ৬০০১ (Direct) নম্বরে।

সুস্থ থাকুন, ভাল থাকুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কৃষক নেতা নিখিলানন্দ সর

—তিনের পাতার পর

করে বর্ধমান সদর-শহরের নেতা-কর্মীরা তাঁর কাছে ছুটে গেলে তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করতেন এবং সাধ্যমতো পরামর্শ দিতেন। কখনো কখনো নেতা-কর্মীদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশও করতেন। তিনি খোসমেজাজে গল্প করতে ভালোবাসতেন। অতীতের সেই সব ঘটনা রূপকথার মতো মনে হতো। সেইসব সুখ-দুঃখের কথা শোনার জন্য অনেকবার তাঁর বাড়িতে গেছি। বেশ কিছুদিন পর যাওয়ার জন্য আত্মঅভিমানসূচক বকুনিও খেয়েছি। তাঁর সঙ্গে নানা সময়ে থেকেছি। খুব কাছ থেকে দেখেছি বড় হৃদয়ের মানুষটাকে।

২০২০ সালের ৩১ জুলাই ৮৪ বছর ১ দিনে তিনি প্রয়াত হলেন।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়ে যাচ্ছে কোভিড যোদ্ধারা শহর জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা : কোভিড যোদ্ধা হিসেবে সরকারি খাতায় নাম নেই অথচ জীবন বাজি রেখে লড়ে যাচ্ছে ছাত্র-যুবরা। যে কাজ করার কথা সরকারের, সে কাজ করছে বাম ছাত্র-যুবরা। শহরের রাস্তাঘাট, অলি-গলি-নালা সব জীবাণুমুক্ত করার কাজে ঝাঁপিয়েছে। ৮ আগস্ট ১০ নং ওয়ার্ডকে জীবাণুমুক্ত করলো শহর-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে। এর আগে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ধারাবাহিকভাবে যোদ্ধার কাজ করে যাচ্ছে নিরলসভাবে। লকডাউন পর্ব থেকেই কখনো কমিউনিটি কিচেন, কখনো সব্জি বাজার, কখনো খাদ্যদ্রব্য বিলি চলছে সমানে। বয়স্কদের জন্য ওষুধ দেওয়ার কাজ করে যাচ্ছে ওরা। সরকারে নেই দরকারে আছে নিবেদিত প্রাণ।

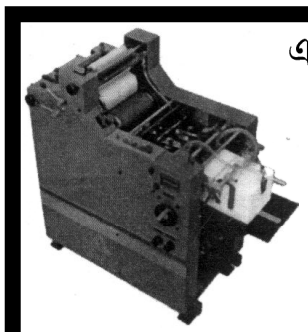

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

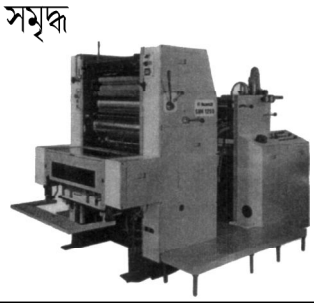

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা